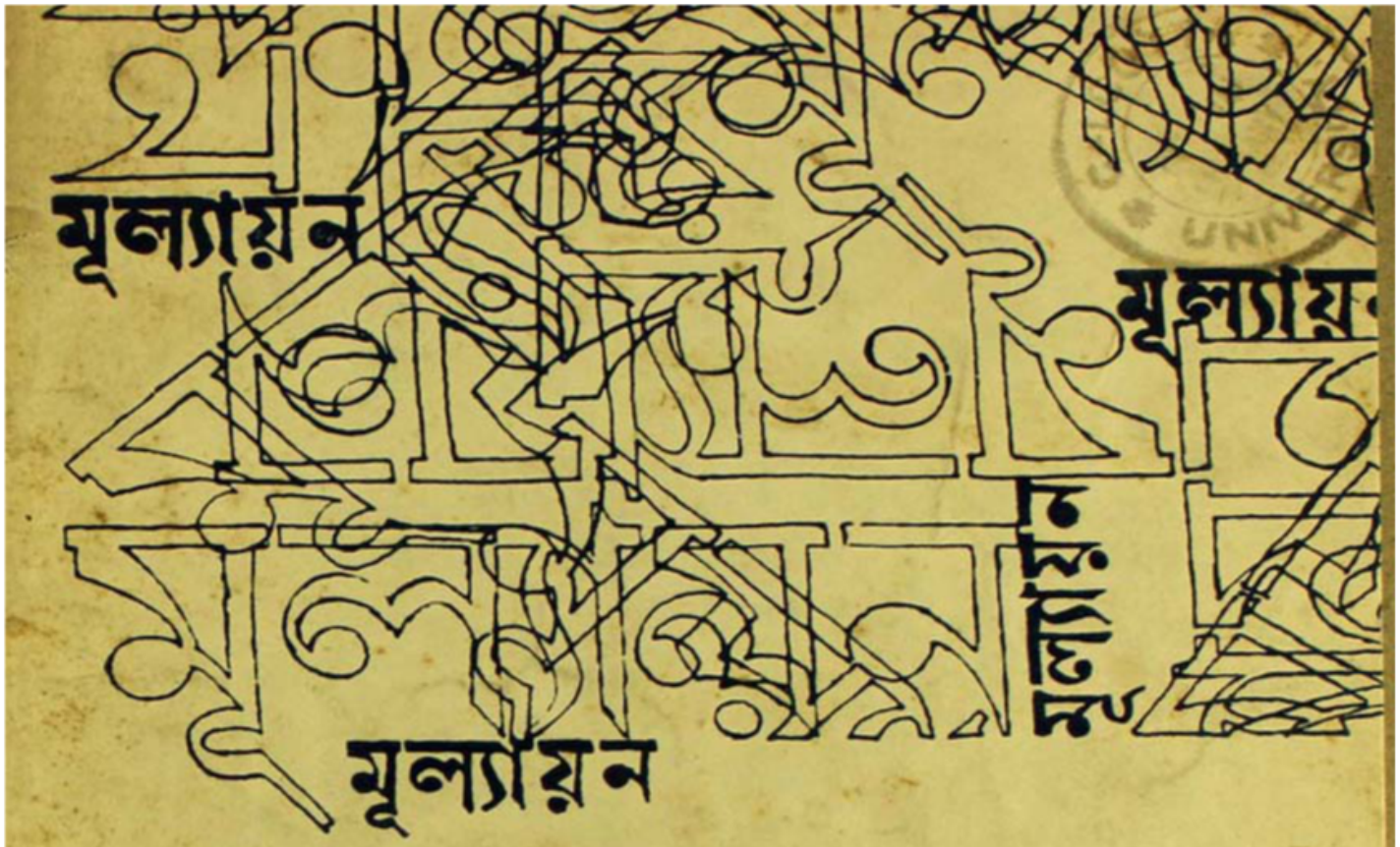

- বামজোটের সরকার সম্পর্কে আমাদের অভিমত
- বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য বলতে কি বোঝায় ?
- ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস

- কার্লমার্কস : ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল
- হার্বার্ট আপথেকার : আমেরিকার বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্র

বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১, ১৩৮৪ মূল্য ঃ দেড় টাকা

মুর্শিদ জাহানকোষা আজ অতীতের স্মৃতি

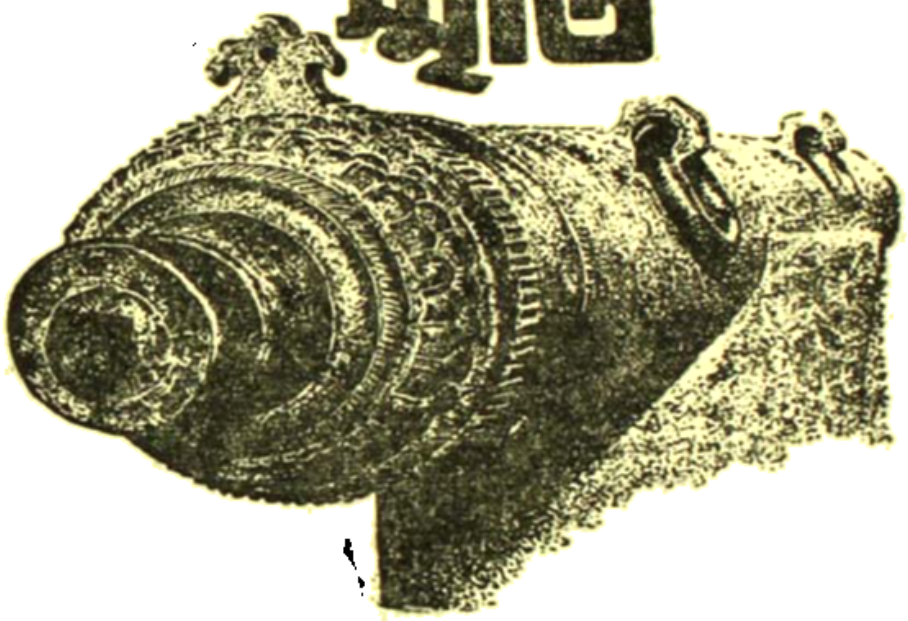

জাহানকোষা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সেরা হাতিয়ার। আজ অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র। অতীতের মুর্শিদাবাদ—ঐশ্বর্য আর বিলাসের লীলাভূমি। যেখানে অতুলনীয় দেশপ্রেম আর ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে সমান গতিতে। এখানে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র স্মৃতিসৌধ, যা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে নবাবী বাঙলার গৌরব-গাথা আর তার পতনের বেদনাময় ইতিহাস। এছাড়াও আজকের মুর্শিদাবাদে আপনি পাবেন অতীত ঐতিহ্যের স্মারক সূক্ষ্ম কারুকার্যে অসাধারণ হাতীর দাঁতের জিনিস পত্র আর সিল্কের শাড়ি। আজই চলুন মুর্শিদাবাদ। দেখে নিন নবাবী আমলের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি। থাকবার জন্যে রয়েছে বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজ। সেখানে পাবেন আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম। বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন : রিজার্ভেশন কাউন্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০১ অথবা ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট),
কলিকাতা-৭০০ ০০১ ফোন : ২৩-৮২৭১
গ্রাম : TRAVELTIPS
পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TB 2BAIR/6

CALCUTTA UNIVERSITY
Latest Publication

Bhartiya Banausadhi. (in Bengali)—Kalipada Biswas and Ekkari Ghosh. Revised by Dr. Asima Chatterjee. 5 Vols. Each Vol Rs.30.00.

Do., Vol. IV.

Do., Vol.. V.

Biplabi Suryya Sen (in Bengali)—Ganesh Chandra Ghosh. Rs. 5.00.

Criitical and Comparative Study of Mahimabhatta—Amiya Kumar Chakrabarty. Rs. 35.00.

Fundamental Questions of Indian Metaphysics—Dr. Susil Kumar Maitra. Rs. 10.00.

Indigenous States of Northern India—Dr. Bela Lahiri. Rs. 50.00.

Indian Anthropology To-day—Edited by D. Sen. Rs. 35.00.

Introducation to Tantric Buddhism—(Third Edition) Dr. S. B. Das Gupta. , Rs. 16.00.

Janamanaser Distrite Sri Madbhagabat Gita, (in Bengali) —Haricharan Ghosh. (Gita Phenomenalogy) Rs. 7.00.

Kavikan Chandi, Part I, (in Bengali)—Edited by Dr. Srikumar Banerjee and Biswapati Chaudhuri, Rs. 200.

Kamala Lecture—Janardan Chakravarty. (Sri Radha Twata-O-Sri Chaitayna Sanskriti—in Bengali), Rs. 12.00.

Kamala Lestures—Dr. Nilratan Dhar. (World Food Crisis) Rs. 15.00.

Nation is Born (A)—Edited by Dilip Kumar Chakravarty. Rs. 50.00.

Narattom Das-o-Tahar Granthabali, (in Bengali)—Dr. Nirod Prosad Nath. Rs. 40.00.

Prachin Bharater Joytirbijnan (in Bengali)—Arupratan Bhattasharyya. Rs. 8.00.

Report on the Study of Mathematics on the Continent of .....Europe. W. H. Young, Rs. 20.00.

Please enquire :—Publication Department. CALCUTTA UNIVERSITY. 48, Hazra Road, Calcutta-19.

মূল্যায়ন

বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১

১৩৮৯

সূচী

	পৃষ্ঠা
ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল/কার্লমার্কস	১
কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (৪)/বরেন সেন	৮
আমেরিকার বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্র/হার্বার্ট আপথেকার	২১
আজকের আমেরিকা/কমল চৌধুরী	৩১
বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য কাকে বলে/রণধীর দাশগুপ্ত	৪৮
সোভিয়েত ইউনিয়নের খসড়া সংবিধান সম্পর্কে লিওনিদ ব্রেঝনেভ'এর রিপোর্ট	৬১
সম্পাদকীয় : পশ্চিমবঙ্গে বামজোটের সরকার সম্পর্কে	৭৩
গ্রন্থ পরিচয় : ভারত-রুশ কথা : বাঙ্গালীর রুশচর্চা	৮০

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক :

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

নরহরি কবিরাজ

পবিত্র রায় কর্তৃক ১০ বঙ্কিম রোড, কলিকাতা-১১ থেকে প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা ১৭ থেকে মুদ্রিত।

● **হ্যারি পলিট :** অনুবাদক—দিলীপ বসু ১·০০

বৃটিশ শ্রমিকের সন্তান

একজন অবিস্মরণীয় শ্রমিক নেতার জীবন আলেখ্য।
সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।

● **ইতিহাসের ধারা :** সুশোভন সরকার ৭·৫০

যাঁরাই ইতিহাসকে বুঝতে চান ও জানতে চান
মানব জাতির অগ্রগতির ধারা—তাদের কাছে
বইটি অপরিহার্য।

● **বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন :**

প্রধান সম্পাদক—ভি. ভি. জাগলাদিন (১ম খণ্ড) ২·০০

● ঐ (২য় খণ্ড) ২·০০

উক্ত বই ২টি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের
গতি প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করবে।

● **স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ বছর :** তুষার চট্টোপাধ্যায় ৭·৫০

স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা ঘটনা ও তাতে ভারতের
বিভিন্ন শক্তির ভূমিকা কি ছিল জানতে হলে
এই বইটি অবশ্যই সংগ্রহ করুন।

মনীষা গ্রন্থালয় : ৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

কার্ল মার্কস

ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল

লণ্ডন, শুক্রবার, ২২শে জুলাই, ১৮৫৩

এ চিঠিতে আমি ভারত সম্পর্কে আমার মতব্যের উপসংহার টানতে চাই। ইংরেজ প্রভুত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল কি করে? মহা মোগলদের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভেঙে ফেলেছিল মোগল শাসনকর্তারা। শাসনকর্তাদের ক্ষমতা চূর্ণ করল মারাঠারা। মারাঠাদের ক্ষমতা ভাঙল আফগানরা; এবং সবাই যখন সবার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন প্রবেশ করল বৃটন এবং সকলকেই অধীন করতে সক্ষম হল। দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রম-জাতিভেদ; এমন একটা স্থিতিসাম্যের ভিত্তিতে সমাজটার কাঠামো গড়া যা এসেছে সমাজের সভ্যদের মধ্যস্থ একটা পারস্পরিক বিরাগ ও প্রথাবদ্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা থেকে;—এমন একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সে কি বিজয়ের এক অবধারিত শিকার হয়েই ছিল না? হিন্দুস্তানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি সত্য ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারাই? বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না; এবং তার অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পরপর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারত সমাজের কোনো ইতিহাসই নেই —অন্তত জানা কোনো ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ঐ অপ্রতিরোধী ও অপরিবর্তমান সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে। ভারত বিজয়ের অধিকার ইংরেজের ছিল কিনা, এটা তাই প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন এই, আমরা কি চাই তুর্কী, পারসীক কি রুশদের দ্বারা ভারত-বিজয়, নাকি বৃটনদের দ্বারা ভারত-বিজয়?

ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলণ্ডকে: একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক—পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।

আরবী, তুর্কী, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত

করেছে তারা অচিরেই হিন্দু-ভূত হয়ে গেছে; ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়। বৃটিশেরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু অনধিগম্য। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে, স্থানীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে এবং স্থানীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে বৃটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া লক্ষ্যেই প্রায় পড়ে না। তা সত্ত্বেও সে ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

এ উজ্জীবনের প্রথম সর্ত হল ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য—মোগল-ই আজম আমলের চেয়েও তা বেশি সংহত ও দূর প্রসারিত। বৃটিশ তরবারি দ্বারা আরোপিত সেই ঐক্য এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হবে। দেশীয় যে সৈন্যবাহিনী বৃটিশ ড্রিল-সার্জেন্টদের দ্বারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছে তা ভারতীয় আত্ম-মুক্তির এবং বহিরাগত যে কোনো আক্রমণকারীর শিকার হওয়া থেকে অব্যাহতির sine qua non*। এশীয় সমাজে এই প্রথম প্রবর্তিত এবং হিন্দু ইউরোপীয়ের সাধারণ যুগ্ম সন্তানদের দ্বারা যা প্রধানত পরিচালিত সেই স্বাধীন সংবাদপত্র পুনর্নির্মাণের এক অভিনব ও শক্তিশালী কারিকা। যত ঘৃণাই হোক, জমিদারি ও রায়তোয়ারি হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দুটি বিশেষ রূপ—এশীয় সমাজের মহান লুপ্তসূত্র হল এইটে। কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের দ্রুত ও নিয়মিত যোগাযোগ এনে দিয়েছে বাষ্প, ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুলিকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব মহাসমুদ্রের বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং ভারতের অচলায়তনের যা প্রাথমিক কারণ, সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে তাকে পুনরুত্থিত করেছে। সেদিন দূরে নয়, যখন রেলওয়ে ও বাষ্পীয় পোতের সমন্বয়ে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পরিমাপে কমে আসবে আট দিনে এবং এই একদা-রূপকথার দেশটা এই ভাবে সত্য করেই পাশ্চাত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

* অপরিহার্য সর্ত—সম্পাঃ।

ভারতের প্রগতিতে এতদিন পর্যন্ত গ্রেট বৃটেনের শাসক শ্রেণীগুলির যা স্বার্থ ছিল সেটা নিতান্ত আকস্মিক, অস্থায়ী ও ব্যতিরেকমূলক। অভিজাত শ্রেণী চেয়েছিল জয় করতে, ধনপতিরা চেয়েছিল লুণ্ঠন, এবং মিল-তন্ত্রীরা চেয়েছিল শস্তায় বেচে বাজার দখল। এখন দান উল্টে গেছে। মিল-তন্ত্রীরা আবিষ্কার করেছে যে উৎপাদনশীল দেশরূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরী এবং সেইজন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও অভ্যন্তরীণ পরিবহন-ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে। এখন তাদের অভিপ্রায় ভারতের ওপর রেলওয়ের এক জাল বিস্তার করা। এবং সে কাজ তারা করবেই। তার ফল অপরিমেয় হতে বাধ্য।

এ কথা অতি সুবিদিত যে, ভারতের উৎপাদনী শক্তি পঙ্গু হয়ে আছে তার বিভিন্ন উৎপাদন-দ্রব্যের পরিবহন ও বিনিময় ব্যবস্থার একান্ত অভাবে। বিনিময় ব্যবস্থার অভাবের জন্যে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মাঝখানে এমন সামাজিক নিঃস্বতা ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। বৃটিশ কমন্স সভার ১৮৪৮ সালে গঠিত একটি কমিটির কাছে প্রমাণিত হয়েছিল যে,

> "খান্দেশে যখন এক কোয়ার্টার শস্য বিক্রি হচ্ছিল ৬ থেকে ৮ শিলিং মূল্যে তখন পুনায় তা বিক্রি হচ্ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শিলিং দামে—সেখানে লোকে দুর্ভিক্ষে মরে পড়ে থাকছিল রাস্তায়, খান্দেশ থেকে সরবরাহ আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কেননা কাঁচা রাস্তায় গাড়ি অচল।"

যেখানে রেলপথ-বাঁধের প্রয়োজনে মাটি দরকার সেখানে পুকুর খুঁড়ে এবং বিভিন্ন লাইন বরাবর জল সরবরাহ করে রেলওয়ের প্রবর্তনকে সহজেই কৃষি-উদ্দেশ্যের সহায়ক করে তোলা সম্ভব। এই ভাবে প্রাচ্যের চাষ ব্যবস্থার যা অপরিহার্য সর্ত সেই সেচ ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত করা যেতে পারে এবং জলাভাবে বারবার দেখা-দেওয়া স্থানীয় দুর্ভিক্ষগুলিকে রোধ করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেলওয়ের সাধারণ গুরুত্ব স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি এমন কি (পশ্চিম-ঘাট পূর্ব-) ঘাটের নিকটবর্তী জেলাগুলিতে সেচহীন জমিগুলির তুলনায় সেচ-দেওয়া জমিগুলির কর তিন গুণ, কর্মসংস্থান দশ-বারো গুণ এবং মুনাফা বারো থেকে পনেরো গুণ বেশি।

রেলওয়ের ফলে সামরিক ব্যবস্থার আয়তন ও ব্যয় কমানোর উপায় হবে। ফোর্ট সেন্ট উইলিয়মের টাউন মেজর কর্ণেল ওয়ারেন কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট বলেন :

"বর্তমানে যত দিন এমন কি যত সপ্তাহ দরকার হয়, মাত্র তত ঘন্টার মধ্যেই দেশের দূর অঞ্চল থেকে সংবাদ পেয়ে যাওয়া এবং আরো কম সময়ের মধ্যে সৈন্য ও রসদসহ নির্দেশ প্রেরণের সম্ভাব্যতা, এ বিবেচনা একটুও ছোট করে দেখা চলে না। বর্তমান অপেক্ষা আরো দূরবর্তী ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলিতে সৈন্যদের রাখা যাবে এবং এতে করে রোগজনিত জীবনহানি বহু পরিমাণে কমানো যাবে। বিভিন্ন ডিপোতে রসদের তত্তটা প্রয়োজন থাকতে পারে না, এবং জলবায়ুর কারণে রসদের ক্ষয়ক্ষতি ও নাশ পরিহার করা সম্ভব হবে। সৈন্যবাহিনীর কার্য-কারিতা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ অনুপাতে কমানো যাবে সৈন্যসংখ্যা।"

আমরা জানি, গ্রাম গোষ্ঠীগুলির পৌর সংগঠন ও আর্থনীতিক ভিত্তি ভেঙে গেছে, কিন্তু এগুলির যা সর্বমন্দ দিক—বাঁধিগৎ ও বিচ্ছিন্ন টুকরোয় সমাজের বিচূর্ণীভবন, সেটার প্রাণশক্তি এখনো বজায়। গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা থেকে সৃষ্টি ভারতে পথঘাটের অভাব এবং পথঘাটের অভাবের ফলে গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা হয়েছে চিরস্থায়ী। নিম্নতম মাত্রার সুযোগসুবিধার ওপর, গ্রাম-গ্রামান্তরের সঙ্গে প্রায় কোনো যোগাযোগ ছাড়াই এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্যে যা অপরিহার্য তেমন আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই এক একটি গোষ্ঠী বেঁচে এসেছে এই ছকের ওপর। গ্রামগুলির এই স্ব-পর্যাপ্ত জাড্য ভেঙে দিয়েছিল বৃটিশেরা, রেলপথ যোগাবে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের নতুন অভাববোধ। তাছাড়া,

"রেলপথ ব্যবস্থার অন্যতম ফল হবে—রেলপথ-প্রভাবিত প্রত্যেকটি গ্রামে অন্যান্য দেশের যন্ত্রপাতি ও কারিগরির জ্ঞান, এবং সে জ্ঞান লাভের উপায় সুলভ হবে, তার ফলে ভারতের বংশানুক্রমিক ও বৃত্তিভোগী গ্রামীণ কারিগর প্রথমত তার পুরো যোগ্যতার প্রমাণ পাবে এবং অতঃপর তার ত্রুটি দূরীকরণের সাহায্য হবে" [চ্যাপম্যান, "ভারতের তুলা ও বাণিজ্য" (৬৪)]।

আমি জানি যে ইংরেজ মিল-তন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথ বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্যে কম দামে তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটার লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের যাত্রায় (locomotion) যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন

করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্পকারখানার ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল-বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যিকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। এ যে নিশ্চয় তা আরো স্পষ্ট এই কারণে যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করছে, একেবারে নতুন ধরনের শ্রম-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং যন্ত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার মতো বিশেষ যোগ্যতা হিন্দুদের আছে। কলকাতা টাঁকশালে যে দেশীয় ইঞ্জিনিয়াররা অনেক বছর ধরে বাষ্পীয় যন্ত্রে কাজ করছেন তাঁদের সামর্থ্য ও নৈপুণ্য, হরিদ্বার কয়লা অঞ্চলে কতকগুলি বাষ্পীয় যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয়গণ এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত থেকে এ ঘটনার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুসংস্কারে ভয়ানক প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও মিঃ ক্যামবেল স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে,

> "ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত শিল্প-ক্ষমতা বর্তমান, পুঁজি সঞ্চয়ের মতো যোগ্যতা তাঁদের বেশ আছে, গাণিতিকভাবে তাঁদের মাথা পরিষ্কার এবং গণনা ও গাণিতিক বিজ্ঞানাদিতে তাঁদের প্রতিভা অতি উল্লেখযোগ্য।" উনি বলছেন, "এঁদের মেধা চমৎকার।"(৬৫)

রেল ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিল্পের ফলে শ্রমের বংশানুক্রমিক সে ভাগাভাগির ওপর ভারতের জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি, ভারতীয় প্রগতি ও ভারতীয় ক্ষমতার সেই চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক ভেঙে পড়বে।

ইংরেজ বুর্জোয়ারা হয়ত বা বাধ্য হয়ে যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন ঘটবে না—এগুলি শুধু উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ওপরেই নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের স্বত্বগ্রহণের ওপরেও নির্ভরশীল। কিন্তু এ দুটি জিনিসের জন্যেই বৈষয়িক পূর্বসর্ত স্থাপনের কাজ ইংরেজ বুর্জোয়ারা না করে পারবে না। তার বেশি কি বুর্জোয়ারা কখনো কিছু করেছে? রক্ত আর কাদা, দুর্দশা ও দীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা কি কখনো কোনো অগ্রগতি ঘটিয়েছে?

খাস গ্রেট বৃটেনেই যতদিন না শিল্পকারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার

বর্তমান শাসক শ্রেণী স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না। যাই হোক, ন্যূনাধিক সুদূর ভবিষ্যতে আশা করতে পারি, দেখব এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির পুনরুজ্জীবন, সেই দেশ যেখানকার শিষ্ট দেশবাসীরা—প্রিন্স সালতিকভের ভাষায়—এমন কি হীনতম শ্রেণীগুলিও "plus fins et plus adroits que les Italiens" (৬৬), যাদের পরাধীনতাও এক ধরনের শান্ত মহত্ত্ব দ্বারা সহনীয় (counterbalanced), স্বাভাবিক অনীহা সত্ত্বেও যারা বৃটিশ অফিসারদের চমৎকৃত করেছে তাদের সাহস দেখিয়ে, যাদের দেশটা হল আমাদের ভাষা ও আমাদের ধর্মের উৎসভূমি, এবং যাদের জাটদের মধ্যে আমরা পাই প্রাচীন জর্মান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকদের জাতিরূপ।

উপসংহারের কিছু মন্তব্য না দিয়ে ভারত প্রসঙ্গে ছেদ টানতে পারছি না।

স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অন্তর্গত বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত। ওরা সম্পত্তির সমর্থক, কিন্তু বাংলায়, মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে যে রকম কৃষি বিপ্লব হল তেমন কৃষি বিপ্লব কি কোনো বৈপ্লবিক দল কখনো সৃষ্টি করছে? দস্যুচূড়ামণি স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের ভাষায়, ভারতবর্ষে যখন সাধারণ দুর্নীতি ওদের লালসার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না, তখন কি ওরা নৃশংস জবরদস্তির পথ নেয়নি? জাতীয় ঋণের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার কথা নিয়ে ওরা যখন ইউরোপে বাগাড়ম্বর করছে তখন ভারতে কি তারা রাজাদের ডিভিডেন্ট বাজেয়াপ্ত করেনি—কোম্পানির নিজস্ব তহবিলেই যে রাজারা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঢেলেছিল? "আমাদের পবিত্র ধর্ম" রক্ষার অছিলায় ওরা ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন একই সময়ে কি তারা ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়নি, এবং উড়িষ্যা ও বাংলার মন্দিরগুলিতে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্যে জগন্নাথের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত্যা ও গণিকাবৃত্তির ব্যবসায় চালায়নি? "সম্পত্তি, শৃঙ্খলা, পরিবার ও ধর্মের" পুরোধা হল এরাই।

ইউরোপ-সদৃশ বিপুল, ১৫ কোটি একর এক ভূখণ্ডের দেশ ভারবর্ষের প্রসঙ্গে দেখলে বৃটিশ শিল্পের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট এবং হতভম্ব করার মতো।

কিন্তু ভোলা উচিত নয় বর্তমানে যে-ভাবে সমগ্র উৎপাদন সংগঠিত, ও হপ° তারই অঙ্গাঙ্গি ফলাফল। এ উৎপাদন দাঁড়িয়ে আছে পুঁজির চূড়ান্ত প্রভুত্বের ওপর। স্বাধীন শক্তি হিসাবে পুঁজির অস্তিত্বের অঙ্গে পুঁজির কেন্দ্রীভবন অপরিহার্য। বর্তমানে প্রতিটি সুসভ্য শহরে অর্থনীতিশাস্ত্রের যে অন্তর্নিহিত অঙ্গাঙ্গি নিয়মগুলি কাজ করছে, বিশ্বের বাজারের ওপর এ কেন্দ্রীভবনের বিধ্বংসী প্রভাব শুধু সেগুলোকেই উদ্ঘাটিত করছে বিপুলতম আকারে। ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগটার দায়িত্ব নতুন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করা—একদিকে মানবজাতির পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ, এবং সে যোগাযোগের উপায়; অন্যদিকে মানুষের উৎপাদনী শক্তির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্যরূপে বৈষয়িক উৎপাদনের রূপান্তর। ভূতাত্ত্বিক বিপ্লবে যেমন পৃথিবীর উপরিতল গঠিত হয়েছে, তেমনি বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্য সৃষ্টি হচ্ছে এক নতুন জগতের বৈষয়িক সর্ত। বুর্জোয়া যুগের ফলাফল, বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদনী শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব আত্মস্থ করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলির জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিকটাকৃতি আদিম দেবমূর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধা পান করতে চায় না।

প্রকাশিত: New-York Daily Tribune,
৩৮৪০ সংখ্যা, ৮ই আগস্ট, ১৮৫৩

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (৪)

রণেন সেন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মীরাট ডিফেন্স কমিটি গঠন করে মীরাট বন্দীদের মামলা পরিচালনা ব্যাপারে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা যে আমরা করি তার উল্লেখ করেছি।

মীরাট মামলায় কমিউনিস্ট আসামীদের আদালতে দেওয়া বিবৃতি তখন ভারতবর্ষের জনমানসে বিশেষত যুবজনমানসে দুটি কাজ করে (ক) কমিউনিস্টরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ও দেশের মুক্তি চায় যদিও তাদের মত ও পথ স্বতন্ত্র (খ) কমিউনিজম কি বস্তু তা জানবার আগ্রহ সৃষ্টি করে।

কমিউনিস্টদের এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতায় বিশ্বাসী হয়েই কংগ্রেসের তরফ থেকে মামলা পরিচালনার জন্য একটা ডিফেন্স কমিটি গঠিত হয় ও উকিল মারফৎ মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা হয়। অন্য দিকে বন্দীদের মধ্য থেকে বেন ব্রাডলেকে কোষাধ্যক্ষ করে ডিফেন্স কমিটি গঠিত হয়। এই দুটির পারস্পরিক সম্বন্ধ কি দাঁড়ায় তা আমার মনে নেই। তবে আমাদের দ্বারা আদায়ীকৃত অর্থ আমরা ব্রাডলের নামেই পাঠাতাম।

কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচারও সঙ্গে সঙ্গে আমরা করে চলেছি।

কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিষয়

ছোট একটা দল—মুষ্টিমেয় যুবক কজন তার সদস্য। তাও গোপনে কাজ করতে হত, দারুণ অর্থাভাব, খাওয়া পড়ার পয়সা ছিলনা তার উপরে প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ান ও কাজ করা যে কত কঠিন ব্যাপার ছিল তা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু কমিটার্ণের প্রতি আনুগত্য, মার্ক্সবাদে অটুট বিশ্বাস, বিশ্ববিপ্লব আসন্ন ও ভারতেও শ্রমিক নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আসবে এই চিন্তায় আমরা মশগুল থাকতাম। দুঃখ, কষ্ট, নির্যাতন, অভাব অনটন

পূর্ববর্তী অংশগুলির জন্য দেখুন: মূল্যায়ন ১২শ বর্ষ, ১ম, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

ও অনাহার তুচ্ছ মনে করতাম। পিতা-মাতা প্রিয়পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা সেই কয়েকজন যুবক পার্টি গঠনের কাজে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ছিলাম। তাই আমরা বাংলাদেশে ক্রমেই পার্টির শক্ত বুনিয়াদ গড়তে সক্ষম হয়েছিলাম। ছোট বড় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা ও কারাখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পার্টিতে টানতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং তাদের অনেকে অল্পকালের মধ্যে পার্টির উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্বের অধ্যায়ে মণি (মন্মথ) চ্যাটার্জির কথা লিখেছি। সে রাজাবাগান কারখানায় কাজ করত, প্রায় অশিক্ষিত শ্রমিক ছিল। পার্টিতে যোগ দিয়ে নিজ চেষ্টায় লেখাপড়া শেখে এবং পরে প্রাদেশিক পার্টির সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়। এটাও আমাদের কৃতিত্বের ব্যাপার নয়।

ঘটনাবহুল ১৯৩৩

১৯৩৩এ লণ্ডন রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে ব্যর্থতার পর মহাত্মাজী আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বাংলাদেশে বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য সরকারী চণ্ডনীতি ব্যাপক আকার ধারণ করে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রখরতা বেশ বিপুল ছিল আর ছিল দেশব্যাপী সরকারী নিপীড়ন। পাইকারী জরিমানা, পিটুনী ট্যাক্স, বিনাবিচারে গ্রেফতার ও আটক, বিচারের নামে বিশেষ ট্রাইবুন্যালে বিপ্লবী-দের কারাদণ্ড নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। বাংলার সব জেল, বন্দীশালা ও আন্দামান রাজনৈতিক বন্দী ও বিপ্লবী ছেলেমেয়েতে ভর্তি। এমনকি বাংলার বাইরে আজমীরের কাছে দেউলীতে বন্দীশালা খুলে বাংলার শত শত বিপ্লবীদের বিনাবিচারে আটক করা হয়েছিল।

আন্দামানে, জেলগুলিতে ও প্রত্যেকটি বন্দীশালায় বন্দীদের মধ্যে মার্কসবাদী সাহিত্য অনুপ্রবেশ করতে থাকে। বন্দীরা পড়াশুনা করতে থাকেন। ব্যাপকভাবে জেল প্রভৃতিতে বিপ্লবের পথ সম্বন্ধে আত্ম জিজ্ঞাসা শুরু হয়, স্টাডি সার্কেল মারফৎ মার্ক্সবাদ নিয়ে ব্যাপকহারে পড়াশুনা চলতে থাকে। এই জেলের বন্দীদের মধ্য থেকে নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট ১৯৩৭-৩৮এ বাইরে মুক্ত হয়ে আসতে থাকে। এই কাহিনী পরবর্তী যুগের আলোচনায় বিশদভাবে লেখা হবে।

আমরা তখন বাইরে বিপ্লবী তরুণদের পার্টির প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা করি। অনেক বিপ্লবী যারা তখনও ধরা পড়েন নি ৪১নং অ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে আমাদের ঘাঁটিতে আসতেন। আমাদের সঙ্গে বিপ্লবের সঠিক পন্থা নিয়ে যুক্তি, তর্ক, বিতর্ক ও আলোচনা করতেন। এই রকম কর্মপন্থায় আমরা কিছু কর্মী পেতে থাকি। বিশেষ করে টেরো কমিউনিস্ট-দের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হই। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সরোজ মুখার্জি (এখন সি. পি. এম সভ্য) জগজ্জিত সরকার (অনেকদিন রাজনীতি পরিত্যাগ করেছে) ইত্যাদি।

মোটের উপর, ৪১নং অ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট সবদিক থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবী-দের ঘাঁটি হিসাবে পরিগণিত হত—বিপ্লবীদের ও সরকারের চোখে। এই ঘাঁটিটার খবর বাইরের সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও পৌঁছেছিল।

জামশেদপুর শ্রমিক অঞ্চলে প্রবেশ

এই সময় আমাদের জামশেদপুরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। সেখানকার শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পুরোপুরি সংস্কার-বাদী রাস্তায় চলত। টাটার ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ইউনিয়নের নেতৃত্ব হোমী নামে এক ব্যক্তির হাতে ছিল। ঠিক ঐ সময় তার কি কারণে জেল হওয়াতে (কারণ মনে নেই) ইউনিয়নের নেতৃত্ব তার অন্যতম অনুচর মঙ্গল সিং নামে একজনের হাতে আসে। সে ছাঁটাই শ্রমিক ও কিছুটা অঙ্গী মনোভাবের হওয়ায় টাটা কর্তৃপক্ষ তাকে নির্যাতন করত। মঙ্গল সিং কলকাতা শিখ সমাজের মারফৎ গেন্দা সিং-এর কাছে সাহায্য চায়। গেন্দা সিং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেয়।

পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী লাহিড়ী ও গেন্দা সিং মঙ্গল সিং-এর সাহায্যের জন্য যায়। তখন টাটায় সন্ত্রাসের রাজত্ব—গভর্নমেন্ট ও টাটার কর্তৃপক্ষ উভয়ে সতর্ক ও সজাগ যাতে কোন বিপ্লবী চিন্তাধারা সেখানে না অনুপ্রবিষ্ট হয় বা বাইরে থেকে আমদানী হয়। পুলিশের গুপ্ত দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে টাটার পাঠান গুণ্ডাবাহিনী সক্রিয়। সুতরাং লাহিড়ী ও গেন্দা সিং-এর প্রবেশ সরকার ও টাটাকে উৎকণ্ঠিত ও চঞ্চল করে তোলে। লাহিড়ী একদিন গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর বিশদ বিবরণের জন্য লাহিড়ীর লেখা পার্টির ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলায় প্রকাশিত 'কমিউনিস্ট' পড়ুন।

যাই হোক টাটানগরে মোটামুটি আমাদের ঘাঁটি গড়ে ওঠে। ঘাঁটিটাকে শক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত হয় যে রেড টি. ইউ. সির কার্যকরী কমিটির সভা টাটানগরে ডাকা হোক (ততদিনে আমরা ঐ নাম গ্রহণ করেছি) এবং সেই সুযোগে ঘাঁটিটাকে পাকা করা যাবে। সর্বভারতীয় নেতারাও আসবেন যদিও তাঁরা দেশপাণ্ডে বা রণদীভে পন্থী, ঘাঁটিটা বাংলার কমিউনিস্টদেরই হাতে থাকবে। কলকাতা থেকে রাত্রের গাড়ীতে আমরা সদলবলে রওনা দিই। দলে ছিলেন হালিম, ডাঃ দত্ত, বঙ্কিমবাবু, অখিল ব্যানার্জি, বাদল গাঙ্গুলী, আমি ও আরও অনেকে। আমি তখন এক বছর হল টি. ইউতে কাজ করছি—হাতে- খড়ি বলা চলে এবং ডাক্তারী পড়ি। তাই কমিউনিস্ট বলে কদর ও খাতির পেলেও টি. ইউ কর্মী হিসাবে কপ্পে পেতাম না।

সারা রাত্রি ঘুম নেই, আড্ডা ও জল্পনা যে আদপেই গভর্নমেন্ট আমাদের ঢুকতেই দেবে কিনা। কার্যকরী কমিটির সভার শেষে দুদিন পর পর দুই আয়গায় জনসভারও প্রোগ্রাম। তাছাড়া টাটার গুণ্ডারা আক্রমণ করবে কি না তাও বিবেচনাধীন ছিল। যাই হোক, নির্বিবাদে জামশেদপুর পৌঁছে দেখি শহর একটা সশস্ত্র শিবির! মোড়ে মোড়ে পুলিশ, সাদা পোষাকে গোয়েন্দা ও টাটার গুণ্ডাবাহিনী আমাদের বাসস্থানের আনাচে কানাচে, আর মিটিং-এর আয়গাতে একেবারে তাঁবু ফেলে প্রায় শতখানেক সশস্ত্র পুলিশ, পাটনা থেকে সদ্য আমদানী আমাদের অভ্যর্থনার জন্য।

কার্যকরী সমিতির সভায় অখিল, লাহিড়ী ও মঙ্গল সিংকে সমিতির সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দেশপাণ্ডে অনুপস্থিত (জেলে ?) তাই সরদেশাই ও ও বঙ্কিম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। এর বেশী আর আমার মনে নেই। ডাঃ দত্ত, হালিম ও বঙ্কিমবাবু তো কলকাতা সম্মেলনেই নির্বাচিত হন।

জনসভায় বিপুল জনসমাগম হয়—এত সন্ত্রাস সত্ত্বেও। দুদিনের বক্তা ছিলেন বঙ্কিমবাবু, সরদেশাই, অবনী ও যোগেশ লাহিড়ী ও মঙ্গল সিং। সভা নির্বিবাদেই হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডি. বি. কুলকার্ণি। সভা ইত্যাদির পর বাংলার কমিউনিস্টদের সঙ্গে বোম্বাই-এর নেতারা বসেন। কুলকার্ণি ও সরদেশাই উভয়ই তখন রণদীভের সঙ্গে (রণদীভেও তখন জি. আই. পি. রেল শ্রমিক হরতাল উপলক্ষে জেলে)। তাই তাঁরা বোঝাতে চাইলেন দেশপাণ্ডে কিরকম বাজে লোক ও তাঁরা কেমন বিপ্লবী। বোধ হয় আমাদের দলে টানা

উদ্দেশ্য ছিল। কারণ দেশপাণ্ডে বা রণদীভের সমর্থক কোনও গ্রুপ "কারখানা" উঠে যাবার পর তাদের বাংলায় আর কিছু ছিল না। কিন্তু আমরা যে কমিন্টার্নের কাছে উভয়ের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ঐক্য ও এক পার্টি গঠনের আবেদন করেছিলাম সেটা তাদের জানা ছিল না। আর আমরা তো বেশ তখন শক্তিশালীই শুধু নই, আমরাই তো একমাত্র কমিউনিস্ট দল বলে বাংলায় খ্যাত ও স্বীকৃত। বিশেষ করে, পার্টি সভ্য না হয়েও ডাঃ দত্ত ও বঙ্কিমবাবু তো সর্বব্যাপারে আমাদের সঙ্গী। মুজাফ্‌ফরের সঙ্কীর্ণতা ও স্পর্শকাতরতা থেকে আমরা মুক্ত ছিলাম এমনকি হালিমকেও মুক্ত করেছিলাম। তাই বোম্বাই-এর কোন খণ্ড পার্টির সঙ্গে কেন যাব।

কিন্তু বেশীদিন টাটানগরে আমাদের কাজ করা হল না। লাহিড়ীর উপস্থিতি কলকাতায় খুবই প্রয়োজন ছিল তাই তার পক্ষে টাটায় ঘাঁটি করে কাজ করা সম্ভব ছিল না। গেন্দা সিং কিছুকাল পরে বহিষ্কৃত হয়। তখন কলকাতা থেকে ধরমবীর সিংকে (একজন গোয়ানীজ) পাঠান হয়। সেও বহিষ্কৃত হয়। পরে মঙ্গল সিং গ্রেফতার হয়। ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ এই দু'বছর আমাদের সেখানে কাজকর্ম চলে। তার মধ্যেই বীজ বপনের কাজ হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে বাংলাদেশ থেকেই আমরা জামশেদপুরে পার্টি গঠন করি। সে কথা পরে। জাতীয় মহাফেজখানায় একটা দলিলে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট পাই ও তাই উদ্ধৃত করছি:

"ফাইল ৭।২০।৩৪ এবং কে ডবলু ১৯৩৪, সিরিয়াল নং ১-৪ (File No. 7/20/34 and K. W. 1934. Serial No 1-4)

মঙ্গল সিং হোমীর অনুগত ব্যক্তি, জামশেদপুর লেবার ফেডারেশনের সভ্য থাকলেও কমিটনিস্টদের হাতে লেবার ফেডারেশন সমর্পণ করতে চেষ্টা করে। ধরমবীর সিংকে ইউনিয়নের কেরানী নিযুক্ত করে। সরকার দ্বারা ধরমবীর টাটানগর থেকে বহিষ্কৃত হয়, পরে ফণী দত্ত কেরানী নিযুক্ত হয়। সেও বহিষ্কৃত হয়। সর্বশেষ মঙ্গল সিং গ্রেফতার হয়।"

রিপোর্টে লক্ষ্যণীয় বিষয় দুটি—(১) লাহিড়ীর নাম একেবারে নেই—কারণ বুঝলাম না। এমন হতে পারে বিশদ রিপোর্টটা আমার দৃষ্টিতে বা হাতে পড়েনি। (২) ফণী দত্ত তো পরে পার্টির সংস্রবে আসে। সরকারী রিপোর্টে অনেক অসত্য ঘটনা ও উল্টোপাল্টা খবরও থাকে। তাই সেগুলিকে সব সত্য মনে না করাই উচিৎ।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

সেপ্টেম্বর মাস ১৯৩৩ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক দ্বারা প্রকাশিত ইনপ্রিকর পত্রিকায় ভি বসাক দ্বারা লিখিত "বর্তমানে ভারতের অবস্থা" শীর্ষক একটা লেখা বের হয়। লেখাটা ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর। লেখকের নামটি ছদ্মনাম। প্রবন্ধে বাংলায় কমিউনিস্টদের কার্যাবলী, সংগঠনের সংবাদ যথা মেটিয়াবুরুজ কমিটির কথা এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব যে কলকাতা কমিটি অব কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া দিচ্ছে তার কথা ভালভাবে উল্লিখিত থাকে। ইনপ্রিকরের সংখ্যাটির নম্বর মনে নেই। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে সি. আই-এর হাতে আমাদের পূর্বধর্ণিত দলিলটি পৌঁচেছে এবং সি. আই. আমাদের রিপোর্টের সত্যতা স্বীকার করেছে এবং আমাদের কমিউনিস্ট ঐক্যের আবেদনটাও সমর্থন করেছে।

আমাদের আনন্দের আর অবধি ছিল না। এতদিনের নিরলস পরিশ্রম সার্থক হল! সি. আই আমাদের কাজের স্বীকৃতি দিল!

এর পর ঘটনা দ্রুত ঘটতে লাগল।

ইনপ্রিকর পত্রিকায় ভারতে কমিউনিস্টদের প্রতি একতার আবেদন জানিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একটা লেখা বের হয়। এই সংখ্যার ইনপ্রিকরটির তারিখ—নভেম্বর, ১৯৩৩।

এর কিছু পরেই ইনপ্রিকরে আবার কমিউনিস্ট ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে তিন পার্টির একটা আবেদন প্রকাশিত হয়।

তিন পার্টির নাম—কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না, পার্টি অব জার্মানী, পার্টি অব গ্রেট বৃটেন। অর্থাৎ এক কথায় আমাদের কার্যাবলী ও এক পার্টি গঠনের আবেদন সি. আই স্পষ্টভাবেই সমর্থন জানাল।

ঐ সময় শুনেছিলাম যে মীরাটের কমিউনিস্ট বন্দীরাও আমাদের সি. আই-এর নিকট প্রেরিত দলিল সমর্থন করে ও আমাদের কার্যাবলীর প্রশংসা করে সি. আই-এর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল। আমেরিকান জাহাজী মারফৎ ১৯৩২ সালে আমরা যে দলিলটা সি. আইকে পাঠিয়েছিলাম তার একটা কপি আমরা মীরাটের কমিউনিস্ট বন্দীদের কাছেও তাদের অবগতির জন্য পাঠিয়েছিলাম। বারবার কমিউনিস্ট বন্দী কথাটা লিখেছি এই কারণে যে সব মীরাট বন্দী কমিউনিস্ট ছিলেন না।

এতদিন পর্যন্ত বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও ভারতের কমিউনিস্ট

আন্দোলনের নানাভাবে যোগাযোগ ছিল। প্রথম পার্সি গ্লাডিং (Percy Glading) নামে বৃটিশ কমিউনিষ্ট বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসাবে এ. আই. টি. ইউ. সির (১৯২৩ জানুয়ারী) সম্মেলনে যোগ দেন ও বৃটিশ সরকার দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে ভারত থেকে বহিষ্কৃত হন। পরবর্তীকালে জর্জ এলিসন (George Allison), ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল (Donald Campbell) ছদ্মনামে বোম্বাই, কলকাতা ও দিল্লি আসেন। জর্জ এলিসন বৃটেনের কয়লা খনি শ্রমিকের ও সি. পি. জি. বির একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তিনিও গ্রেপ্তার ও পরে ভারত থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে আমি সুইডেনে আই. এল. ও সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষ্যে লণ্ডনে কয়েকদিন ছিলাম যখন কমরেড রজনী পাম দত্ত আমাকে এলিসনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

ইনপ্রেকরে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও আবেদনগুলির ফলে আমাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেশ জমে উঠল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতি! ও কি সোজা ব্যাপার। তাই যেমন একদিকে হঠাৎ পুলিশের তেন দৃষ্টি আমাদের উপর, ৫১নং জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের উপর কড়া ভাবে পড়ল তেমন অন্যদিকে ছোট ছোট-খাটো কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন গ্রুপ ও টেরো কমিউনিস্ট বন্ধুরাও আমাদের দিকে আকৃষ্ট হল।

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সূচনা

১৯৩৩-এর মাঝামাঝি ডাঃ অধিকারী ও পি. সি. জোশী ছাড়া পান। বোম্বাই-এ কমিউনিস্ট গ্রুপের প্রতিনিধিদের এক সভা বসে। এই সভায় বাংলা কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে আমরা হালিম ও লাহিড়ীকে পাঠাই। বোম্বাইতে দেশপাণ্ডে গ্রুপকেই স্বীকার করা হয়। নাগপুর গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করে এম. এল. জয়ন্ত। সেখানে স্থির হয় যে, সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলন কলকাতায় হবে, সেখানে একটা পার্টি থিসিস গ্রহণ করা ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন (নির্বাচন) করা হবে। এই সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য বোম্বাই বৈঠকে একটি সংগঠনী কমিটি গঠন করা হয়। লাহিড়ী বলে যে, তারা পাঞ্জাব গ্রুপকেও যোগাযোগ করে এবং এলাহাবাদে বোম্বাই-এর পরে আর একটা বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু এলাহাবাদে পাঞ্জাব থেকে কেউ আসে না। যাই হোক, এলাহাবাদের কথা আমার মনে ছিল না। সম্প্রতি লাহিড়ীর সঙ্গে কথা বলায় সে এলাহাবাদ বৈঠকের চেষ্টার কথা আমায় বলে।

যাই হোক, কলকাতায় সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি আমরা করতে থাকি। সম্মেলন কলকাতায় ডিসেম্বরে বসে ও কিন্তু তার আগে বাংলা কমিটিতে সম্মেলনের ব্যাপারে একটা প্রচণ্ড বিরোধ হয় ও ফলে ভাঙ্গন দেখা দেয়।

১৯৩৩-এর মাঝামাঝি কলকাতায় মস্কো থেকে একজন রেড প্রফেসর আসে। সি. আই-এর প্রমাণপত্র নিয়ে আসায় আমরা তাকে ভালভাবেই গ্রহণ করি। আমাদের কমিটির সদস্য না হলেও তাকে আমাদের সভায় আমন্ত্রিত করা হত। তাছাড়া আমরা তার সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শও করতাম। এই ব্যক্তির নাম আবদুল্লা সফদার। এক সফদারের নাম আমরা পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় পাই। এ মামলাই ভারতে প্রথম কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা। আসামীরা বিজয়ত দলের সভ্য যারা ভারত থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই আফগানীস্তানের পথে সোভিয়েট দেশে যায় ও অনেকে আবার কমিউনিস্ট হয়ে হিমালয়ের দুর্গম পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মস্কো থেকে ফিরে গ্রেফ্তার হয় ও মামলায় পড়ে। এদের কাহিনী নিয়ে শওকত ওসমানী (কানপুর ও মীরাট মামলায় সাজাপ্রাপ্ত) তার বই "পেশোয়ার থেকে মস্কো" লিখেছেন। যাই হোক, তিনি সেই সফদার কিনা তাকে কোনও দিন জিজ্ঞাসা করি নি। সফদার কমিটির সাথে পৃথক পৃথক আলোচনায় ও কমিটির একটি বৈঠকে বলে যে, ভারতে কেন্দ্রীভূত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সময় আসে নি। একটা সংগঠনী কমিটি বড়জোর বসান যেতে পারে। তাই কলকাতা সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য যখন একটা থিসিস গ্রহণ করা ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা তখন এই সম্মেলনে যোগ দেওয়া সঠিক হবে না।

বাংলা কমিটির কিছু সভ্যদের মনে দ্বিধা এসে গেল এবং প্রচণ্ড ঘোঁট পেকে উঠল।

এদিকে সম্মেলন আগতপ্রায় প্রস্তুতির তদ্বিরের জন্য ডাঃ অধিকারী ও জোশী কলকাতায় হাজির। জোশী তো ৪১ নম্বরেই উঠেছে।

তখন বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বাংলা কমিটির সভা ডাকা হল কলকাতা ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে। এখন যেখানে জ্যোতি সিনেমা তার ঠিক ডান পাশে অর্থাৎ লাগোয়া পূব দিকে একটা ৬ তলা বাড়ী আছে তার ছাদের উপর একটা ছোট ঘরে ইউনিয়ন অফিস। কমিটির সভায় ডাঃ অধিকারী ও জোশী সর্বভারতীয় সম্মেলন সম্পর্কে কিছু বলতে চাইলে অবনী চৌধুরী ঘোর আপত্তি

করে বলে যে, তাদের বাংলা কমিটির বৈঠকে আসার কোন অধিকারই নেই। তারা বেরিয়ে গেলে বৈঠক বসে। সভায় যোগ দেয় হালিম, আমি, লাহিড়ী, ননী বোস, অবনী চৌধুরী, স্বদেশ বোস। মণি চ্যাটার্জি ও সত্য ঘোষও বোধ হয় উপস্থিত ছিল। সভায় সভাপতিত্ব করি আমি। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, সম্মেলনে যোগ দেওয়া নিয়ে সদস্যরা সমান সংখ্যায় বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তিন বনাম তিন বা চার বনাম চার। তবে আমি, লাহিড়ী ও হালিম জোরের সঙ্গে সম্মেলনে যোগ দেবার পক্ষে বলি। উভয় পক্ষ সমান দাঁড়ালে আমি সভাপতি হিসাবে কাস্টিং ভোট দিয়ে সম্মেলনে যোগ দেবার প্রস্তাব পাস হল বলে ঘোষণা করি। অবনীর দল প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করে। এবং পার্টিও পরে ত্যাগ করে। সভায় রণেন, হালিম ও লাহিড়ী সম্মেলনে যোগ দেবে বাংলার পক্ষ থেকে তাও ঠিক হয়। যাই হোক, বাংলা কমিটি ভাগ হলেও দলের তলার দিক ঠিক থাকে। কলকাতায় সর্বভারতীয় সম্মেলন ডিসেম্বর ১৯৩৩-এ বসে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে ঐ তারিখ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সম্মেলনের প্রথম বৈঠক জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের আমজাদিয়া হোটেলের এক-কক্ষে প্রথম দিন বসে। দ্বিতীয় বৈঠক কোমেদনবাগান লেনের (ইউরোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেনের নিকট) এক খালি বাড়ীতে খবরের কাগজ পেতে হয়। তৃতীয় বৈঠক মানিকতলা হাসপাতালে আমার ঘরে (আমি তখন সেখানে হাউস সার্জন) চতুর্থ ও পঞ্চম বৈঠক বসে হাওড়া মেছোহাটার পিছনে মসজিদের (মৌলভী আমার বন্ধু ছিলেন) পাশে পোর্ট শ্রমিকদের বাসস্থানে ও হাওড়া বামুনগাছি এক রেল শ্রমিকের বাড়ীতে (ইনিও আমার বন্ধু ছিলেন)। সম্মেলনে যোগ দেয় বাংলা থেকে হালিম, লাহিড়ী ও আমি, বোম্বাই থেকে ডাঃ অধিকারী ও এস. ভি. পাটকর, নাগপুর থেকে এম. এল. অয়মন্ত, উত্তরপ্রদেশ থেকে পি. সি. জোশী ও পাঞ্জাব থেকে গুরমিত সিং। সম্মেলনে ডাঃ অধিকারীর লেখা খসড়া রাজনৈতিক থিসিস পাস হয় ও নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি সম্মেলনে যোগদানকারী সকলকে নিয়েই গঠিত হয়। ডাঃ অধিকারী কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ঠিক হয় কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের নাম ও থিসিসটা সি. আই-এর কাছে পাঠান হবে।

১৯৩৪-এর গোড়ায় ঐ থিসিসটা ছাপান হয়। অর্থাৎ সি. আই স্বীকার করে নিল আমাদের। সেদিনের আনন্দ ও গর্ব রাখার আমাদের স্থান ছিল না।

সফদারের অবদান কমিউনিস্ট আন্দোলনে অত্যন্ত বিতর্কমূলক হওয়ায় আমরা খবরাখবরে জানতে পারলাম যে, সে মস্কোর প্রমাণপত্র আনলেও আসলে রায়পন্থী ছিল। তাই পার্টি গঠনে বাধা দেয়। আমি এই সফদারকে রামগড় কংগ্রেসে (১৯৪০-এর শুরুতে ?) রায়পন্থী কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখি। যদিও লাহিড়ী বলে যে, ১৯৩১-এ লাহোরে আব্দুল মজিদের (পেশোয়ার ও মীরাট বন্দী) বাড়ীতে সফদারকে সে পার্টি সভ্য হিসাবে দেখে। যাই হোক, তার ভূমিকা বেশ ভাল ছিল বলে আমার ধারণা নয়।

১৯৩৬-এর অন্যান্য কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা

কলকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ১৯২৭ সালে গঠিত হয়। ১৯৩০-৩১-এ জগদীশ মৈত্র নামে একজন ট্রাম কণ্ডাক্টার-এর নেতা ছিল। ডাঃ দত্ত ও চারু সান্যাল নামে এক উকিলও ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সাল থেকে এই ইউনিয়ন আমাদের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়। অবনীই নেতা, সঙ্গে ইসমাইল (যদিও সে ১৯৩৬-এ সভ্যপদ পায়) সুতরাং পার্টিতে ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যাই হোক, ইসমাইল সভ্যপদ পেয়ে আবার ইউনিয়ন আমাদের কাছে নিয়ে আসে। ইসমাইল এখন সি. পি. এমে এবং ট্রাম ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে একটা পাল্টা সংগঠন তৈরী করেছে।

ইণ্ডিয়ান প্রোলিটারিয়ন রেভেলিশনারী পার্টি (আই. পি. আর. পি)

১৯৩২-এর শেষ ভাগে বা '৩৩-এর গোড়ায় এই পার্টি গঠিত হয়। প্রধানত জাতীয় বিপ্লবী দলের মধ্যে যারা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয় (টেরো কমিউনিস্ট) বা কংগ্রেস থেকে এই পথের যারা সন্ধানী হয় তারা এই পার্টি গঠন করে। কিন্তু এরা সমাজতন্ত্রের পথে অনুপ্রাণিত হয় জেলে বঙ্কিমবাবুর ও বাইরে ডাঃ দত্তের স্টাডি সার্কেল মারফৎ। এই দলের গোড়াপত্তন পাঁচু ভাদুড়ী, কালী ঘোষ (চন্দননগর) ও বিজয় মোদক (সম্ভবত) করেছিল। কিন্তু তারা ১৯৩১-এ গ্রেফ্‌তার হয়ে যাওয়ার পর যারা থাকে তারা এই পার্টি গঠন করে। 'গণনায়ক' নামে একটা পত্রিকাও প্রকাশ করে এই পার্টি। এই পার্টি থেকে প্রথম জেলে বেরিয়ে আসে ১৯৩২-এর শেষ ভাগে সরোজ মুখার্জি। কিন্তু এদের

সঙ্গে আমাদের, আলাদা দল হলেও, সদ্ভাব ছিল, যুক্ত কাজকর্মও হত। তার অন্যতম কারণ এদের উপর বঙ্কিমবাবু ও ডাক্তার দত্তের প্রভাব।

১৯৫৪-এ এই দলের প্রায় প্রত্যেক সক্রিয় কর্মী আমাদের পরামর্শ মত ব্যক্তিগতভাবে পার্টি সভ্যপদ প্রার্থনা করে ও পায়। ১৯৩৪-এ যারা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ এই পার্টি থেকে পায় তাদের মধ্যে অন্যতম বিশ্বনাথ মুখার্জি। ১৯৩৬-৩৭-এ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পাঁচুবাবু, কালী ঘোষ ও বিজয় মোদক পার্টি সভ্যপদ পান। মনোরঞ্জন হাজরা ও তুষার চ্যাটার্জি '৩৪ এ পার্টিতে আসেন।

বেঙ্গল লেবার পার্টি

কারখানা গ্রুপ ও সাম্যবাদ দল আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আরও একটা নতুন দলের '৩৩-এ আবির্ভাব হয়—বেঙ্গল লেবার পার্টি। এদের সম্বন্ধে একটু বিশদ লেখা প্রয়োজন।

১৯৩২-এ ইংলণ্ড থেকে কিরণ মলাক ও ডাঃ বীরেন গুহ এবং নির্মল সেনগুপ্ত ভারতে ফেরে। ইংলণ্ডে রেজিলাণ্ড ব্রিজম্যানের সভাপতিত্বে তখন "লীগ এগেন্সট ইম্পিরিয়ালইজম" পরিচালিত হত। এরা দুজন এই সংগঠন ও ব্রিজম্যানের সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়। ভারতে এসে এরা স্টাডি সার্কেল ইত্যাদি গোপনে গঠিত করতে থাকে ও এক সময় "কারখানা গ্রুপের" সঙ্গে সংযুক্ত হয়। কিন্তু নিজেদের সম্পূর্ণ গোপন রাখে।

১৯৩৫-এ এদের বন্ধু নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারও ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফেরে। নীহারেন্দু ইংলণ্ডে ডাঃ জেড আহমেদ, ডাঃ কে. এম. আশরফ প্রভৃতিরও বন্ধু ছিল। ১৯৩৩—এই গ্রুপের নেতৃত্বে বাংলা ভাষায় "ছাত্র দল" নামে একটা মাসিক পত্রিকা বের হয়। ভবানীপুরে এই পত্রিকার অফিসে আমিও যাতায়াত করেছি। পত্রিকার পাতা ছিল প্রমোদ সেন ও কমল সরকার (এখন সি. পি. এম)।

অন্যদিকে দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বে "বেঙ্গল লেবার পার্টি" এই সালের শেষ দিকে গঠিত হয়। যতখানি মনে আছে এই পার্টির কার্যক্রম ছিল টি. ইউ গঠন করা ও তার মারফৎ মার্কসবাদী ভাবধারা প্রচার করা, কিন্তু কার্যত ইকনমিজমই প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল।

বাংলাদেশে এদের প্রভাব ১৯৩৪-৩৬ পর্যন্ত নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পরে এই পার্টির অনেক সভ্য কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ায় যোগ দেয়। যারাত্তরে তার উল্লেখ করব। এই পার্টির সভ্যা লতিকা সেন বাংলার প্রথম নারী সভ্যা কমিউনিস্ট পার্টির (১৯৩৬) এবং ১৯৪৯-এ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন—সঙ্গে প্রতিভা, গীতা ও অমিয়াও ছিলেন।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের নারী শহীদ চারজন অমর হয়ে থাকলেন।

রায়বাদী গ্রুপ

১৯৩৩ বাংলায় রজনী মুখার্জির নেতৃত্বে রায়বাদী পার্টি গঠিত হয়। এই গ্রুপের কাজ প্রধানত মধ্যবিত্তের ও কিছুটা শ্রমিকের মধ্যে ছিল।

পুলিশের চোখে আমরা সবেত সকলেই কমিউনিস্ট এবং সেই মত সরকারও ব্যবহার করত।

১৯৩৩ সত্যাগ্রহ স্তিমিত প্রায়, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও দমিত ও ছত্রভঙ্গ। কমিউনিজমের ভাবধারা ও কথা বেশ চালু। এই প্রত্যেকটি পার্টিই মোটামুটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। এই পটভূমিতে বাংলার শিক্ষিত যুবক কমিউনিস্ট পার্টি ও উক্ত অন্যান্য পার্টির দিকে ঝুঁকছিল।

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল (সি এস পি)

১৯৩৪ ভারতে এই দল জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গঠিত হয়—উদ্দেশ্য কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদী পথে দৃঢ় রাখা, কংগ্রেসের মধ্যে সোস্যালিস্ট ভাবধারা প্রচার করা ও কংগ্রেসের মধ্যে বাম ও সোস্যালিস্ট শক্তিকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা। আর পি ডি এই দল সম্পর্কে ১৯৩৪এ একটা প্রবন্ধ লেখেন যা ইন্‌প্রিকরের একটা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম "কংগ্রেস সোস্যালিজম—এ মিসনোমার"। প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে কংগ্রেসে থেকে সোস্যালিজম প্রচার করা বা বামপন্থী শক্তিকে সুদৃঢ় করা বা কংগ্রেসকে ওপথে উদ্বুদ্ধ করাও সম্ভব নয়। নিজের স্মৃতি থেকেই এই সব কথা লিখছি।

এই সব দলের উৎপত্তি ও ক্রিয়াকলাপের ফলে আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ দাঁড়াল এই দলগুলির মতবাদের সমালোচনা করা, মুখোস খোলা ও প্রতিপন্ন করা যে এই কোন দলই মার্ক্সবাদী অর্থাৎ কমিউনিস্ট নয়, সবগুলিই সংস্কারবাদের রকমফেরের পসরা সাজিয়ে বসেছে। ইস্‌তাহার, পামফ্লেট,

ষ্টাডিসার্কেল ও বিতর্ক সভায় ঐ দলগুলির উপর আমরা আক্রমণ চালাতাম। এই সি এস পি সম্পর্কে আরও পরে লিখতে হবে। এই দল ভারতের মানচিত্রে বিশেষ রেখাপাত করেছে। আমাদের পার্টির সঙ্গেও ১৯৩৫।৩৬ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্কে যথাস্থানে লিখব। দক্ষিণ ভারতে ১৯৩৬।৩৭ নাগাদ সব কমিউনিস্ট এই দলে যোগদেন এখন কি উত্তর ভারতেও অনেকে (অবশ্য পার্টিরই নির্দ্দেশে)।

আমেরিকার বিপ্লবের শ্রেণীচরিত্র

হার্বার্ট আপথেকার

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকা, পুস্তক পুস্তিকা ও শিক্ষায়তন-গুলিতে আমেরিকার বিপ্লব সম্পর্কে দুটি আপাতবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

একটি: যেখানে বলা হয়ে থাকে আমেরিকার বিপ্লবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি একটি বিপ্লবই নয় অথবা বড় জোর একটি রক্ষণশীল বিপ্লব। এই ধারণাটি সরকারী ঘোষণাগুলিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিশতবার্ষিকী কমিশনের চিন্তাধারায় পুরোপুরিভাবে বর্তমান রয়েছে।

অপর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আমেরিকার বিপ্লব ধারণা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে একেবারে নিখুঁত; মানুষের অর্জিত সাফল্যের একেবারে সারবস্তু এবং বর্তমান-কালেও এটি পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই ঘটনাকে সর্বকালের জন্য এক ত্রুটিহীন নিখুঁত মডেল হিসাবে প্রতিপন্ন করার যে প্রবণতা তাহল ইতিহাসের মিথ্যাচার এবং তা বর্তমানের স্থিতাবস্থার ভিত্তিকেই দৃঢ় করতে সাহায্য করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা যেসব শ্রেণীর হাতে ছিল, এই বিপ্লবে তাদেরই একমাত্র কর্তৃত্বের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যে শ্রেণীগুলির মধ্যে তখন শুধু বুর্জোয়ারা নয় দাসমালিকরাও ছিল। বিপ্লব সম্পর্কে এই ধারণার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীসংগ্রামগুলির বাস্তবতাকেই শুধু ছোট করে দেখানো হয় না। এর ফলে, এমন কি, সম্পত্তির মতো ব্যবহৃত যে দাসত্ব, ইণ্ডিয়ান জনগণের প্রতি যে গণহত্যার নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল, এসবের বাস্তবতা এবং এই উভয় বর্বরতার যুক্তি ও সমর্থন হিসাবে যে জঘন্য বর্ণবিদ্বেষবাদকে ব্যবহার করা হয় তা খর্ব করা হয়, বা এমন কি উপেক্ষা করা হয়।

আবার, আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষ করে, উগ্র বামপন্থী ও অন্যান্য রাজনৈতিক অর্বাচীনদের মধ্যে আমেরিকার বিপ্লব সম্পর্কে সম্পূর্ণ এক অবজ্ঞার মনোভাব রয়েছে এবং তারা এই সমগ্র ঘটনাটিকেই প্রহসন, অর্থহীন, ছলনা অথবা ধাপ্পাবাজি বা এই রকমের কোন নাম দিয়ে, যা এই উদ্ভাবনকারীদের বুদ্ধি-

হীনতার পরিচয় দেয়, নস্যাৎ করে দিতে চায়। বিপ্লব সম্পর্কে এই মত পোষণ করার বাস্তব পরিণাম হল, এই বিপ্লবকে খাটো করে দেখানো এবং বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানকে দাঁতের মাজন ও গন্ধনাশক দ্রব্য বিক্রয়ের অনুষ্ঠানে পর্যবসিত করার সরকারী প্রয়াসকেই সাহায্য করা।

যে বিপ্লবের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হল তা তিনটি মৌল শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারই ফল—(ক) ঔপনিবেশিক শক্তি ও উপনিবেশ-বাসীদের সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ ; (খ) উপনিবেশগুলির মধ্যের বিরোধ যা তাদের শ্রেণীবৈষম্য প্রকাশ করে এবং এই সত্যটি তুলে ধরে যে, যখনই এই বিরোধ রাজনৈতিকভাবে এক বিস্ফোরণের পর্যায়ে উপনীত হয় তখনই ব্রিটেনের শক্তি স্থিতাবস্থার পক্ষে ও জনগণের শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় ; এবং (গ) বহু পুরুষ ধরে একজন মার্কিন ও একজন ইংরাজ হওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য সেই চেতনার বিকাশ অর্থাৎ একটি নতুন জাতি ও তার ফলে এক নতুন জাতীয় চেতনার বিকাশ। বলা যেতে পারে যে, এই শক্তিগুলির দ্বন্দ্বমূলক একত্রীকরণ একে অপরকে প্রভাবিত করতে ও তীব্রতর করতে সাহায্য করেছে যেমন ক ও খ, গ-কে অগ্রসর করতে এবং শেষোক্তটি পূর্বোক্তকে জোরদার করতে সাহায্য করেছে।

যে বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য লেনিন এই বিপ্লবকে সেই সব অতি মুষ্টিমেয় মহান, প্রকৃত মুক্তিদায়ী, প্রকৃত বিপ্লবী যুদ্ধগুলির অন্যতম একটি বলে বর্ণনা করে-ছিলেন (কালেক্টেড ওয়ার্কস্, ২৮ খণ্ড, পৃঃ ৬২) সেগুলি হল—

আমেরিকার বিপ্লব হল আধুনিক ইতিহাসের প্রথম সফল ঔপনিবেশিক সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম এক জাগ্রত জনগণ কর্তৃক সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর সামরিক ও নৌ-শক্তির পরাজয় সূচিত করেছিল।

তত্ত্বে ও কর্মে এই বিপ্লব জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যা দেখা যায়।

এটি সমস্ত মানুষের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যা লক্ষ্যণীয়। অবশ্য এই ঘোষণাপত্রের রচয়িতারা মানুষ বলতে শুধু পুরুষ মানুষ বুঝিয়েছিলেন, নারী নয়। তাঁরা বুঝিয়েছিলেন সম্পত্তির অধিকারী মানুষ, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, ক্রীতদাস বা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ নয়। কিন্তু তথাপি সময়ের বিচারে কথাটির এই সীমাবদ্ধ ব্যবহারও তদানীন্তন বিশ্বের প্রচলিত অবস্থার তুলনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি।

এই বিপ্লব ও তার পরিণতিতে যে শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার দ্বারা জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটিই ঘোষণা করা হয়েছিল। আবার যাঁরা এই ঘোষণা করেছিলেন তাদের কাছে এর অর্থ অষ্টাদশ শতাব্দীতে "জনগণের" যে ধারণা—পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ ও সম্পত্তির অধিকারী—তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এমন কি তখনও, জনগণের মধ্যে অনেকেই এর সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ করেছিলেন। উপরন্তু, জনগণের সার্বভৌমত্বের এই ধারণাটি ছিল একেবারে নতুন কারণ এতদিন পর্যন্ত সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিলেন সর্বময় অধিকর্তা এবং এই শব্দগুলির সঙ্গে যে মহিমা ও মর্যাদা যুক্ত ছিল তা বোঝাবার জন্য শব্দগুলিকে বড় হরফে লেখা হত। এই অর্থে 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' এই শব্দটিই একটি নতুন আবিষ্কার এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর পরিপূর্ণ রূপায়ণ, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ইতিহাসের মূল বিষয় হয়ে রয়েছে।

নাগরিকদের 'জীবন স্বাধীনতা ও সুখের অন্বেষাকে সম্ভব করে তোলাই একটি সরকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত'—এই রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল। এখানে 'নাগরিক' কথাটি লক্ষ্যণীয়, প্রজা নয়। আর সুখের অন্বেষা এই শব্দটি জন লকের বক্তব্য যে সরকারের উচিত জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করা, তার থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এর অর্থ এই নয় যে, বিপ্লবের জনকরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করাই যে সরকারের মূল উদ্দেশ্য এই ধারনাটি বর্জন করেছিলেন বরং বিপরীতভাবে তারা এটিকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এটি লক্ষ্যণীয় যে লকের ধারণাকে সংশোধন করা হয়েছিল।

বিপ্লববাদীরা বারবার জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, যে সরকারের উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য আছে, সেই হল সত্যিকারের সরকার, এই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে তথাকথিত সরকার স্বৈরাচারে পর্যবসিত হয়। বিপ্লবীরা ঘোষণা করেছিলেন (এবং কাজেও তা করছিলেন) যে, যখন সরকারের এই ধরনের অধঃপতন দেখা যায় তখন তাকে পরিবর্তন করার এবং সরকারের সঠিক লক্ষ্যের সঙ্গে তাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য সমস্ত রকমের চেষ্টা সেই দুর্দশাগ্রস্ত দেশের অধিবাসীদের শুধু অধিকার নয়, কর্তব্যও। আর যদি এই ধরনের পরিবর্তন কেবলমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটিও সম্পাদন করা যেমন অধিকার, তেমন কর্তব্যও।

বিপ্লববাদীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে, রাজতন্ত্র ও উত্তরাধিকার সূত্রে

প্রাপ্ত আভিজাত্য, জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা ও সুখের অন্বেষাকে সমর্থন জানানোর সরকারী লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন এবং মানুষের সমতার ধারণারও পরিপন্থী। এইজন্যই তাঁরা প্রতিটি বিদ্রোহী উপনিবেশে ও কেন্দ্রে প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করেছিলেন আর এইভাবে তাঁরা পূর্বতন রাষ্ট্রকে "চূর্ণ" করে এক নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে যে, বিপ্লবের দুটি প্রধান বিষয়—স্বাধীনতা ও প্রজাতান্ত্রিক সরকার সংবিধান দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ, যদি কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে নাকচ করতে চায় সে যেমন রাষ্ট্রদ্রোহী বলে বিবেচিত হবে, ঠিক তেমনই যদি কেউ এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারী ব্যবস্থার অবসান করতে চায় সেও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে চিহ্নিত হবে। বিপ্লবী যুদ্ধের সাফল্যের পর একপুরুষ ধরে এই উভয়ের ক্ষেত্রেই যথেষ্ট আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল আর সব বিপ্লবেরই বৈশিষ্ট্য হল যে, একবার সাফল্য অর্জন করলে বিপ্লবের মূল লক্ষ্যগুলির, তা স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রই হোক, বা স্বাধীনতা আর সমাজতন্ত্রই হোক, কোন বিরোধিতা অনুমোদন করা হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টিকেও স্বীকৃতি জানিয়েছিল যে, একটি রাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়ার কোন 'স্বাধীনতা' সেখানে নেই।

প্রচলিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে "চূর্ণ" করার প্রশ্নটি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ১৭৬০-এর দশকের শুরু থেকে বিপ্লবী প্রক্রিয়া যতই প্রসার লাভ করছিল, ততই কিছু কিছু আইন-বহির্ভূত আর কখনও বা বেআইনী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছিল যেমন, কমিটিস্ অফ করেস্পন্ডেনস, সন্স (অ্যাণ্ড ডটার্স) অফ্ লিবার্টি, সন্স অফ্ নেপচুন (শহরগুলির বিপ্লবী আন্দোলনে জাহাজী শ্রমিকদের প্রধান ভূমিকাটিকে প্রতিফলিত করেছিল) এবং অন্যান্য গোষ্ঠী যাদের বলা হত অ্যাসোসিয়েটরস্। এই সবগুলিই ছিল যোগাযোগ রক্ষা, প্রচার ও সর্বোপরি সংগঠনের হাতিয়ার। এইগুলি ক্রমে একটি নতুন নাম ও আবেগ সহ একটি শাসন সংস্থার রূপে—একটি কংগ্রেসে—শেষ পর্যন্ত কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে পরিণত হয়েছিল। এই সব সাধারণ অনাড়ম্বর নাম ইচ্ছাকৃতভাবে দেওয়া হয়েছিল যা তাদের সংগ্রাম-মুখীন গণচরিত্রকে প্রতিফলিত করেছিল। তাদের অগ্রাধিকারিককে শুধুমাত্র সভাপতি বলা হত যদিও বিপ্লবী আন্দোলনের কিছু কিছু দক্ষিণপন্থী 'মহামহিম' প্রভৃতি আরও

জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় খেতাব সুপারিশ করেছিল। এমন কি, তখনকার সবচেয়ে জনবহুল শহর, ফিলাডেলফিয়ার কোথায় কংগ্রেসের অধিবেশন হবে তাও বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ বিপ্লবী আন্দোলনের রক্ষণশীল অংশ আবার রাষ্ট্রীয় ভবনই, যা এতদিন রাজকীয় কর্মচারীরা ব্যবহার করত, কংগ্রেসের উপযুক্ত স্থান বলে দাবী করছিল। কিন্তু শহরের ছুতোরদের আমন্ত্রণে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের আরও চরমপন্থী অংশের অনুমোদনের ফলে শেষ পর্যন্ত এটি নাকচ হয়ে যায়। ফলে কংগ্রেস ছুতোরদের সভাকক্ষে মিলিত হয়—যে সভাকক্ষের নাম এখন বড় হরফে কার্পেন্টার্স হল বলে লেখা হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশীর ভাগ মানুষই এখন জানে না যে আজকের এই হল শুধুই শহরের ছুতোরদের (ও অন্যান্য মিস্ত্রি ও কারিগরদের) একটি সভার স্থান ছিল।

এই বিপ্লবে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছা ও শক্তি প্রকাশ পাওয়ায় জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটি জীবন্তরূপ লাভ করেছিল। সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে বোঝা যায় যে, জনগণের অন্ততঃ ৫০ শতাংশ গুরুত্বপূর্ণভাবে ও সচেতনভাবে এই বিপ্লবী প্রচেষ্টার অংশীদার ছিল। এই তথাকথিত "সাধারণ" লোকেরাই বিপ্লবের চালিকাশক্তি ছিল। তারাই বয়কট আন্দোলন পরিচালনা করেছিল, রাজার অফিসারদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করেছিল, বিপ্লবের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছিল এবং সমকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিমান সামরিক ও নৌ-শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল।

আমেরিকার এই বিপ্লবই তাৎপর্যপূর্ণ গেরিলা যুদ্ধনীতির সূচনা করেছিল—যার সঙ্গে মেরিয়ন, সামটার ও ফক্সের মত মহান নামগুলি জড়িত রয়েছে। সত্য-সত্যই, এই যুদ্ধ গেরিলা কায়দায় পরিচালিত হয়েছিল, যেমনটি হয় প্রত্যেকটি জনযুদ্ধে। ওই বাহিনীগুলি প্রায়শঃই "অসম্ভবকে" সম্ভব করেছিল, যেমন টেন্টনের বরফ জলকে অতিক্রম করেছিল এবং ষ্টোনী পয়েন্টের মত পর্বতসমূহকে চূর্ণ করেছিল; উপনিবেশবাসীরা ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে যে যুদ্ধপদ্ধতি শিক্ষা করেছিল—গাছ ও শিলাখণ্ডের পেছনে লুকিয়ে থাকা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর নির্ভর করা, তারা সেইভাবেই যুদ্ধ করেছিল। ইউরোপের রাজাদের নিযুক্ত ও ভাড়াটিয়া সৈন্যরা যুদ্ধের যে নিয়মকানুন রচনা করেছিল সেই অনুসারে যুদ্ধ করে নি বলে যুদ্ধের পর বহু পুরুষ ধরে ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় আমেরিকাবাসীদের "শঠ" ও হীনচেতা বলে উল্লেখ করতো।

বিদ্রোহীদের এলাকায় সব বড় বড় শহরগুলি ইংরাজরা দখল করে নিয়েছিল ; এইগুলি ছিল উপকূলে অবস্থিত এবং তখন কেউই ইংরাজ নৌ-বাহিনীকে বেশীদিন প্রতিরোধ করতে পারত না। কাজেই নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং চার্লস্টন তারা দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু একবার ইংরাজবাহিনী দেশের মধ্যে প্রবেশ করার পর তারা যে শুধু ক্রমবর্ধমান সৈন্য চলাচল ও সরবরাহের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তাই নয়, তারা এমন এক বৈরী জনগণের সম্মুখীন হয়েছিল যারা তাদের এই বৈরীভাব প্রদর্শন করতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হয় নি।

দক্ষিণভাগেই ইংরাজরা সবচেয়ে সামরিক সাফল্য অর্জন করেছিল এবং বেশীর ভাগ অঞ্চলই দখল করেছিল। এর কারণ হল সেখানকার জনগণের প্রায় ৩৫ শতাংশই হল অস্থাবর সম্পত্তির মত ব্যবহৃত ক্রীতদাস এবং বারবার দাবী করা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা এই ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করায় তারা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে সৈন্যবাহিনীতে তালিকাভুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা তারা পেয়েছিল, তারা বিপ্লবী বাহিনীতে যোগদান করেছিল (সম্ভবত প্রায় পাঁচ হাজার এইভাবে যোগ দিয়েছিল) কিন্তু সাধারণভাবে এই ক্রীতদাসেরা যেখানেই স্বাধীনতা সেখানেই দিয়েছিল এবং তার ফলে ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩-র মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ লোক দক্ষিণের বাগিচাগুলি ছেড়ে পলায়ন করেছিল। যুদ্ধরত ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়করা দাসত্ব প্রথা অবসান করা বিজ্ঞজনোচিত হবে বলে লণ্ডনের কাছে সুপারিশ করেছিলেন এবং জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, তা করা হলে দক্ষিণভাগের বিপ্লব এক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু লণ্ডন তাদের এই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ সবচেয়ে ধনী দাসমালিকদের অনেকেই ছিল নিজেরা টোরী এবং ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে প্রায় ৭৫০,০০০ ক্রীতদাস ছিল এবং একবার দাসত্ব প্রথা বিলোপের পতাকা তুলে ধরলে তাকে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা অত্যন্ত কঠিন।

উপনিবেশের প্রায় ৩০০,০০০ ইণ্ডিয়ান জনগণের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। অর্থাৎ তারা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হতে সমর্থ হয় নি এবং তাদের এই মারাত্মক অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে মার্কিনরা ও ইংরাজরা ইণ্ডিয়ান জনগণের কিছু কিছু অংশকে হয় নিজেদের দিকে নিয়ে আসতে অথবা নিরপেক্ষ রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। এক ফল হয়েছিল এই যে ঐ জনসাধারণের কিছু অংশ এক পক্ষের

হয়ে আর কিছু অংশ অন্য পক্ষের হয়ে লড়াই করেছিল আবার কিছু একেবারেই সরে থেকেছিল। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ঐক্য ব্যতীত তাদের পক্ষে কোন সফল রণনীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয়নি এবং বিপ্লবের অবসানে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈরিতার নীতি ইণ্ডিয়ান জনগণের পক্ষে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল।

এই দুই ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার যে প্রচণ্ড দুর্বলতা, এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যখন বুর্জোয়ারা তরুণ ও ঐতিহাসিক অর্থে প্রগতিশীল, সেই সময়েও একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই বিপ্লবের এক অতি বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক চরিত্র রয়েছে। অবশ্য ১৭৬০-এর দশক থেকে শুরু করে, এই আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে, উপনিবেশের এই প্রতিবাদ আন্দোলন ইংলণ্ডের সাধারণ প্রতিবাদ আন্দোলনেরই একটি অংশ ছিল। এই জন্যই যখন উপনিবেশের অধিবাসীরা তাদের জন্য "ইংরাজদের অধিকারসমূহ" দাবী করেছিল তখন রাজা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন শুধুমাত্র এই কারণেই নয় যে তারা জাতিতে ইংরাজ ছিল না, তারা ছিল উপনিবেশবাসী কিন্তু আরও এই কারণে, যেমন তিনি বলেছিলেন—"যদি আমি বোস্টনের জনতার কাছে নতি স্বীকার করি তা'হলে আমি কি করে লণ্ডনের জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করবো?" উপরন্তু, ইংলণ্ডের বাণিজ্যনীতির, যা ইংরাজ শাসক শ্রেণীরই স্বার্থ সাধন করতো তার বিরুদ্ধে এই দাবীগুলি কেবলমাত্র উপনিবেশের বণিক ও বাণিজ্যের মালিকরাই উত্থাপন করে নি; নাবিক, শ্রমিক, ভৃত্য, এমন কি ক্রীতদাসেরাও এই দাবিগুলি উত্থাপন করেছিল। এদেরও কতকগুলো বিশেষ ও জরুরী অভিযোগ ছিল যেমন —তাদের নিজদের বাড়ীতে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে সৈন্যশিবির স্থাপন করা, উপনিবেশগুলিতে এমন চড়া বেতনে ইংরাজ সৈন্য নিয়োগ করা, যে বেতনের এক সামান্য অংশ উপনিবেশের শ্রমিকরা সাধারণভাবে পেতো, রাজার সামরিক ও নৌবাহিনীতে "সাধারণ" লোকদের বলপূর্বক নিযুক্ত করা।

এই সব জনগণের দিক থেকে সংগঠিত বিরোধিতা ছিল আমেরিকার বিপ্লবের একটি মৌলিক বিষয় এবং তাদের এই বিরোধিতার কাছে নতি স্বীকার করা ব্রিটেনের সম্রাট, অভিজাত সম্প্রদায় ও শাসক চক্রের (এবং উপনিবেশে তাদের সহযোগীদের অনেকের) কাছে ছিল একেবারেই সভ্যতার সমাপ্তি।

এই যুদ্ধের পরিণতিতে কানাডার জনগণের একটি প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা

গ্রহণে অস্বীকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। আর একটি মৌলিক বিষয় ছিল আয়ারল্যাণ্ডে প্রচণ্ড বিপ্লবী আন্দোলন যার ফলে ইংলণ্ডের রাজাকে তাঁর কিছু শ্রেষ্ঠ বাহিনীকে বোস্টনে না পাঠিয়ে ডাবলিনে পাঠাতে হয়েছিল। আর অবশ্যই ইউরোপে যে আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করছিল এবং ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল তার ফলে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং হাঙ্গেরী থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা মার্কিনদের পক্ষে যোগদান করেছিল। এছাড়াও, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড, স্পেন ও ইংল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বও আমেরিকার বিপ্লবীদের কূটনীতির সাফল্য সম্ভব করে তুলেছিল।

এই বিপ্লব অবশ্যই উপনিবেশবাদের শৃঙ্খলের একটি গ্রন্থিকে তখন চূর্ণ করে দিয়েছিল। এই বিপ্লব রাজতন্ত্রকে পরাজিত করতে এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। এই বিপ্লব জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকার, কর্মের বিনিময়ে খাজনা প্রদান, ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারের এমন ব্যবস্থা করা যাতে হস্তান্তরিত করা না যায়—সামন্ততন্ত্রের এইসব বিপুল অবশেষগুলিকে অপসারিত করেছিল। এই বিপ্লবের ফলে ঋণের দায়ে অথবা চুক্তিবদ্ধ দাসত্বের ক্ষেত্রে কারাবাসের প্রথার অবসান ঘটেছে। এই বিপ্লব রাষ্ট্র ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা করেছে; শিক্ষা সম্পর্কে ধারণাকে প্রসারিত করেছে; নারীদের অধিকারের কোন কোন দিককে আরও অগ্রসর করতে সাহায্য করেছে; হাজার হাজার ক্রীতদাসের দাসত্ব মুক্তি ঘটিয়েছে এবং উত্তরভাগে সম্পত্তির মতো ব্যবহৃত দাসত্বের অবসান ঘটিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক দাস ব্যবসাকে বে-আইনী করার বিষয়টিকেও কয়েক ধাপ অগ্রসর করে দিয়েছে।

সমসাময়িকদের মধ্যে কেউ কেউ আরও বেশী চেয়েছিলেন; বিশেষকরে গণসংগঠনগুলি আরও ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত করার, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়াকে খর্ব করার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাকে আরও অগ্রসর করার ব্যাপারে বিশেষতঃ আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল। কিছু কিছু নারী ও মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নারীদের জাগরণের অংশ বলে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে স্পষ্টত ব্যর্থতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আর মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ বারবার এই বলে দাসত্বের অবসানের জন্য আবেদন করেছিলেন যে এ এমন এক ক্ষত যা প্রজাতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত

হবে এবং এখন তার অঙ্কুরেই যদি একে বিনাশ করা না যায় তাহলে একদিন জাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে।

কিন্তু উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের হাতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বিপ্লবের চূড়ান্ত নেতৃত্ব থাকায়, "গণতন্ত্র" ও "স্বাধীনতা"র অর্থের ক্ষেত্রে ঐ সব শ্রেণীর প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা, একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই রয়েছে পুঁজিবাদের জন্মের সঙ্গেই যার উদ্ভব, সেই বর্ণবিদ্বেষবাদ এবং পুরুষদের প্রাধান্যের দৃষ্টিভঙ্গী। উপরন্তু সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির মধ্যে সামগ্রিক ভাবে এক আভিজাত্যবোধ ছিল আর তাই আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন "জনগণ, মহাশয়, এই জনগণ হল একটি বিরাট পশু" এই বলে সতর্ক করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন; জন অ্যাডামস্ "ধনী, সমর্থ, এবং সদ্বংশজাত" ইত্যাদি সমার্থক শব্দগুলি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রধান বিচারপতি জন জে মনে করতেন যে এই কথাটি অতি সহজেই স্বয়ং উপলব্ধি করতে পারা যায় যে "যারাই দেশের মালিক, তাদেরই দেশ শাসন করা উচিত।" এমন কি টমাস জেফারসন সহরের জনতার কথা চিন্তা করে তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন "শূয়োরের পাল।"

তাদের কাছে এবং তাদের শ্রেণীদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হল সমস্তরকম নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি এবং যা হল সম্পূর্ণভাবেই একটি রাজনৈতিক ব্যাপার, কোনরকমভাবেই অর্থনৈতিক নয়। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তারা বিকাশ লাভ করেছিল তা ছিল তাদের ক্ষেত্রে "স্বাধীনতা" এবং (তাদের কাছে) একটি সাফল্যমণ্ডিত সরকারের সমস্যা হল একদিকে স্বৈরাচারকে (রাজতন্ত্র) আর অপরদিকে "নৈরাজ্য" ও "বিশৃঙ্খলাকে" নিয়ন্ত্রণ করা এবং শেষোক্তটির দ্বারা তারা প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক জনগণের শাসন বোঝাতো। কিন্তু তথাপি, অষ্টাদশ শতকে জনগণের শক্তি ও তাদের অংশগ্রহণই এই বিপ্লবের সাফল্য এবং এর যা কিছু ইতিবাচক অবদান তাকে সম্ভব করে তুলেছিল। ১৭৮১ সালে ইয়র্ক টাউনে লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন ওয়াশিংটনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তখন ব্রিটিশ বাদ্যযন্ত্রে "পৃথিবীটা একেবারে উল্টে গেছে" ঐ সুর বাজান হয়েছিল—ব্রিটিশ বাদ্যযন্ত্রের এই সুর এই আভাসই দিয়েছিল যে এই আত্মসমর্পণ হল এক নতুন ঘটনা, দীর্ঘদিনের প্রচলিত এক রাজার ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর অপর এক বাহিনীকে পরাজিত করা নয়, এ হল বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রীদের বিজয়।

লেনিন যখন এক অপরিণীম উন্নত ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব—সমাজতন্ত্রের জন্য বিপ্লবকে—পরিচালিত করছিলেন তখন তিনি তাঁর মার্কিন শ্রমিকদের কাছে চিঠি"তে এখানকার বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতি আবেদন জানাতে এবং তাদের একথা স্মরণ করিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন যে এই দেশ এক প্রকৃত বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাদেরই সহযোগী মেহনতী মানুষ, তাদেরই শ্রেণী সহোদরদের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, রক্ত ও শ্রমেরই সৃষ্টি। আমাদের আজকের যুগে, পৃথিবীতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা রয়েছে বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমজীবি পুরুষ ও নারীর চেতনা ও সংগঠিত শক্তির মধ্যে।

এই বিপ্লবকে ঔপনিবেশিক ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের, বর্ণবিদ্বেষ ও সব ধরনের আভিজাত্যবোধের অবসানের এবং শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্যে অগ্রসর বিগত দুশো বছরের মানব ইতিহাসের পথে একটি বিরাট পথ নির্দেশ হিসাবে উপলব্ধি করাই হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বিপ্লবের বিশতবার্ষিকীর গভীরতম তাৎপর্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের যে ঘোষণাপত্র, বিপ্লবের সেই অবিস্মরণীয় ঘোষণাপত্রের প্রতিশ্রুতিগুলিকে, এই বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতন্ত্রই, বিংশ শতাব্দীতে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

অনুবাদ : দীপিকা বসু

* (হাওয়ার্ড জিনের লিখিত : "আমেরিকার বিপ্লবের শ্রেণীচরিত্র"—প্রবন্ধের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ—প্রবলেমস অব পিস অ্যাণ্ড সোস্যালিজম, জুলাই, ১৯৭৬ থেকে গৃহীত)

আজকের আমেরিকা

সামরিক শক্তি। গবেষণা। ব্যয়

কমল চৌধুরী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় ক্রমবর্ধমান। ১৯৭৪ খৃঃ আর্থিক বছরে সামরিক ব্যয়বাবদ যে অতিরিক্ত মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছিল এবং ১৯৭৫ খৃঃ আর্থিক বছরের জন্য সামরিক ব্যয়ের যে প্রস্তাব করা হয়, সেগুলি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মাত্র এক বছরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় পনের থেকে কুড়ি শতাংশ বেড়ে গেছে। উত্তর আতলান্তিক জোটের (ন্যাটো) মার্কিন মিত্রদের সামরিক ব্যয়ও বেড়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করে ব্রুকিং ইনস্টিটিউটের গবেষকরা লেখেন: "এই বছরের (১৯৭৪ খৃঃ আর্থিক বছর) প্রতিরক্ষা বাজেটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিকালীন মনোভাবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তনের এবং তার ফলে বিরোধ হ্রাসের সম্ভাবনার পটভূমিতে প্রতিরক্ষাভঙ্গী সৈন্যবল ও প্রতিরক্ষা কর্মনীতি সম্পর্কে মূলতঃ একই জায়গায় অবস্থানকে প্রতিফলিত করছে এবং প্রতিরক্ষার ব্যয় বেড়েই চলেছে।"

১৯৭৫ খৃঃ আর্থিক বছরের মার্কিন সামরিক বাজেটে একথা সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া এই বছরে ২ অক্টোবর এগার হাজার দুই শত কোটি ডলার প্রতিরক্ষাব্যয় বিল প্রতিনিধিসভায় অনুমোদিত হয়। লক্ষ্য করা গেছে যে, ১৯৭৩ খৃঃ গোড়ার দিকে পরিকল্পিত ১৯৭৪ খৃঃ আর্থিক বছরের সামরিক বাজেটে প্রকৃত ব্যয় ধরা হয় সাত হাজার নব্বই কোটি ডলার। ১৯৭৪ খৃঃ গোড়ার দিকে মার্কিন সরকার কংগ্রেসে অতিরিক্ত মঞ্জুরী হিসাবে ছয়শত কোটি ডলারের কিছু বেশী এবং ১৯৭৪ খৃঃ সামরিক ব্যয় বাবদ আট হাজার ছয়শত কোটি ডলার—প্রকৃতপক্ষে, মোট নয় হাজার কোটি ডলার খরচের অনুমতি দিতে অনুরোধ করেন। এইভাবে ১৯৭৪ খৃঃ আর্থিক বছরে কমব্যয়ের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার জায়গায় প্রকৃতপক্ষে এক বছরের মধ্যেই প্রকৃত ব্যয় কার্যতঃ কুড়ি শতাংশ বেড়ে যায়।

মার্কিন কংগ্রেসের জয়েন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর উইলিয়ম প্রক্সমায়ার বলেছিলেন যে, এটা খুবই স্পষ্ট যে সামরিক কর্মসূচীতে অত্যধিক অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, এর অতি-ব্যয় অত্যন্ত বিপুল এবং টাকার অপব্যয় ও অপদার্থতা সামরিক সরবরাহকারীদের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জেনারেল ও শিল্পপতিরা সাধারণের অর্থ নিয়ে কিভাবে খোলামকুচি খেলছেন, ফাঁস হয়ে যাওয়া গোপন তথ্যে তা জানা গেছে।

একশত পঞ্চাশ কোটি ডলার অপব্যয় হয় বিশ্ব সুপারমার্কেটের নক্সা প্রস্তুত ও নির্মাণে। এটি এখন স্মারক চিহ্ন হিসাবে মিউজিয়মের শোভাবর্ধন করছে। একান্ন কোটি কুড়ি লক্ষ ডলার জলাঞ্জলি দেওয়া হয় নিউক্লিয়র শক্তিচালিত বিমান নির্মাণে, সাতষট্টি কোটি আশি লক্ষ ডলার স্মার্ক বোবোট বোমারুর জন্য, আটষট্টি কোটি ডলার নাভাহো রকেটের ডিজাইন প্রস্তুত প্রয়াস, চল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ 'মহাকাশচারী বিমানের' জন্য, চুয়াল্লিশ কোটি স্কাইবোল্ট রকেটের জন্য খরচের পর, বহু প্রকল্পের মতই এগুলিও বাতিল হয়ে যায়।

কনট্রাক্টে যে দর নির্ধারিত হয়, উৎপন্নদ্রব্যের দাম তার দুইগুণ বা তিনগুণ বেশী ধার্য করে সামরিক শিল্প কর্পোরেশন নির্লজ্জভাবে। ১৯৬৯ খৃঃ ১৮ জুন লাইফ এ সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করে:

—১৯৬৩ খৃঃ সাতশত সৈন্যকে সুপারসনিক গতিতে বহন করার জন্য পেন্টাগন লকহীড-এ একশত কুড়িটি সি-৫এ বিমানের অর্ডার দেয়। সর্বসাকুল্যে অর্ডারের মূল্য ধার্য হয় দুইশত নব্বই কোটি ডলার। পরে পেন্টাগনের সম্মতিক্রমে এই দাম বাড়িয়ে করা হয় তিনশত দশ কোটি ডলার। তারপর অঙ্কটা আরও দুবার সংশোধন করা হয় চারশত কোটি ডলারেরও বেশী। পেন্টাগন এ সমস্ত তথ্য কংগ্রেসের কাছ থেকে গোপন করে রাখে।

—ঐ লকহীড কোম্পানিই প্রত্যেকটি চৌদ্দ লক্ষ ডলার মূল্যে পেন্টাগনকে তিনশত পঁচাত্তরটি চেয়নি হেলিকপ্টার সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে, পরে প্রত্যেকটির দাম বাড়িয়ে করে চব্বিশ লক্ষ ডলার। পরীক্ষার সময় দেখা গেল এই হেলিকপ্টারগুলি অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য এবং কাজের পক্ষে অনুপযোগী। অর্ডার বাতিল হলেও, বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়ে যায় তার আগেই।

—মার্কিন সেনবাহিনী জেনারেল মোটরকে একটি নতুন শেরিডান রকেট

ট্যাঙ্কের অর্ডার দেয়। দশ বছর ধরে নক্সা তৈরির কাজ চললেও, এই ট্যাঙ্ক ছোট-পাল্লার রকেটও ছুঁড়তে পারে না। শেরিডান ট্যাঙ্কের জন্য সৈন্যবাহিনী একশ কোটি ডলারেরও বেশি ব্যয় করলেও, তখনও পর্যন্ত ট্যাঙ্ক সরবরাহ করা হয়নি।

এই সময়ে বিষাক্ত গ্যাস ও জীবাণু অস্ত্র উৎপাদনের এক কেলেঙ্কারী ফাঁস হয়ে যায়। এ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্টি হয় দারুণ উত্তেজনা। তখন এ বাবদ খরচ হয়েছিল একশত কোটি ডলার। ভাষ্যকার ড্রু পিয়ারসনের মতে আমেরিকার "সমর বিভাগ" (বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে) এত পরিমাণ নার্ভ গ্যাস প্রস্তুত করিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত মানুষ ও পশুপক্ষী মেরে ফেলবার পক্ষে যা যথেষ্ট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একলক্ষ সংস্থা পেন্টাগনের সঙ্গে নানান চুক্তি ও উপ-চুক্তিতে সরাসরিভাবে হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক যুদ্ধের কাজে বাঁধা রয়েছে। অবশ্য, এই সব চুক্তির লাভের বেশির ভাগই যায় আঙুলগুনতি একদল রাঘববোয়াল একচেটিয়াপতিরই পেটে। এই সম্পর্কে নিউজউইক পত্রিকার ১৯৬৯ খৃঃ ৯ জুন প্রকাশিত একটি তালিকায় পাওয়া যায়:

জেনারেল ডাইনামিক্স (এফ-৩ জঙ্গী বোমারু, পোলারিস সাবমেরিন) ১৯৬৮ খৃঃ দুইশত কুড়ি কোটি ডলার প্রতিরক্ষা বিক্রয়;

লকহীড (সি-১৪১ মালবাহী বিমান, পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র)—একশত নব্বই কোটি ডলার;

জেনারেল ইলেকট্রিক (জেট ইনজিন, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি)—এক শত পঞ্চাশ কোটি ডলার;

ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট (জেট ইনজিন, হেলিকপ্টার)—একশত ত্রিশ কোটি ডলার;

ম্যাকডোনেল ডগলাস (ফ্যানটম এফ-৪ জঙ্গী বোমারু, ডগলাস এ-৪ বোমারু)—একশত দশ কোটি ডলার। এই কোম্পানিটি পেন্টাগন থেকে মোট পঁয়ত্রিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ ডলার মূল্যের একশতটি ফ্যানটম-৪ বিমানের নতুন অর্ডার পায়।

লা-মঁদে পত্রিকার ভাষ্যকার জাক আমালরিক, সামরিক-শিল্প সমাহার সংক্রান্ত বিষয়ে যিনি একজন বিশেষজ্ঞ লেখেন যে, "এইসব বিরাট কর্পো-রেশনের সংখ্যা যে খুব বেশি নয়, তা থেকেই বোঝা যায় যে, নিলামের মারফৎ

পেন্টাগণের বৃহত্তম অর্ডারগুলি বিলি করার কোনও প্রকৃত কার্যবিধি নেই। এইসব ক্ষেত্রে মাত্র দুটি বা তিনটি সংস্থা সেইসব অর্ডার পায়। সেজন্য কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে সবচেয়ে ভালভাবে যোগাযোগ রেখে চলাটা হল তাদের স্বার্থের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ···ব্যক্তিগত সংযোগের গুরুত্ব এত বেশি বলেই অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদক সংস্থাগুলি বড়কর্তাদের নাগালে পাবার জন্য দৌড় লাগিয়ে দিয়েছে।"

বলা যেতে পারে, এই দৌড় বস্তুতপক্ষে এক কেলেঙ্কারির পর্যায়ে পৌঁচেছে। সেনেট সদস্য প্রক্সমায়ার বলেছেন যে "পেন্টাগনের কাছে সরবরাহকারী এক-শতটি বড় সংস্থার বেতনভুক হয়ে আছেন এখন দু হাজার বাহাত্তর জন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ অফিসার (১৯৫৯ খৃঃ এঁদের সংখ্যা ছিল সাত শত একুশ জন)। আমাদারিকের বক্তব্য যে, এর প্রধান উদ্দেশ্য হল মাত্র এইসব প্রাক্তন অফিসার-দের পোষা এ জন্যই যাতে তারা তাদের আগেকার সহকর্মী, যারা এখনও পেন্টাগনের পদস্থ অফিসার হয়ে রয়েছেন (এবং যাদের পদোন্নতির ব্যাপারেও এদের সুপারিশ কাজ দেয়), তাদের সঙ্গে সংযোগ রেখে যান, কত অস্ত্র দরকার তার চাহিদা জেনে নেন এবং সম্ভব হলে, কত অর্ডার দেওয়া দরকার তারও সুপারিশ করে আসেন।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন এক নতুন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে, যার মাথায় নিউক্লিয়র বোমা বসিয়ে আকাশ থেকে কিংবা ভূপৃষ্ঠ থেকে অথবা সমুদ্রগর্ভ থেকে উৎক্ষেপন করা যেতে পারবে এবং যা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ২৫০০ সামুদ্রিক মাইল দূরত্বের মধ্যে যে কোন লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে আঘাত হানতে পারবে। এই ক্ষেপণাস্ত্রে এখন ফাইনাল টাচ দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা এই ক্ষেপণাস্ত্রকে ক্ষেপণাস্ত্রের প্রযুক্তিবিদ্যার এক অসাধারণ সাফল্য বলে বর্ণনা করেছেন। এই রকম সাংঘাতিক ক্ষেপণাস্ত্র সারা পৃথিবীতে আর কখনও তৈরি হয়নি। সারা বিশ্বের সামরিক ও নিউক্লিয়র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই ক্ষেপণাস্ত্র গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এখন পর্যন্ত যত শক্তিশালী রেডার তৈরি হয়েছে তার কোনটাতেই ধরা না দিয়ে এই ক্ষেপণাস্ত্র অনায়াসে তার লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং এই ক্ষেপণাস্ত্রকে একরকম অবিনাশী বলা যেতে পারে। এই ক্ষেপণাস্ত্র ১৬৯ মিটারেরও কম উচ্চতা দিয়ে যেতে পারে বলে তা রেডারের আওতার মধ্যে পড়বে না। আবার এই ক্ষেপণাস্ত্র শব্দের গতিবেগের চেয়েও কম গতিবেগে চলতে পারে এবং

এ থেকে যে রেডার ও অবলোহিত সঙ্কেত পাঠান হয় তা এত ক্ষীণ যে, কম উচ্চতার বায়ুমণ্ডলীর পটভূমিতে রেডার তা ধরতে পারে না।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ক্ষেপণাস্ত্রের দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-ক্ষমতা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যাবে এবং তার যুদ্ধব্যয় প্রচুর পরিমাণে কমে যাবে। এই ধরনের এক একটা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে খরচ পড়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার। আমেরিকার মানদণ্ডে এই পরিমাণ বেশ কম। এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র দেখতে টেলিফোনের থামের মত— লম্বায় ৬·১ মিটারেরও কম আর ব্যাসে ৫০·৮ সেন্টিমিটারের কিছু বেশী। এতে শক্তি যোগায় টার্বোজেট ইঞ্জিন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যে পরিমাণ রাসায়নিক মারণাস্ত্র মজুত ছিল বর্তমানে সেই মজুত বেড়েছে চার গুণ। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আশ্বাস এবং মার্কিন সোভিয়েত বিভিন্ন চুক্তি সত্ত্বেও রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের ভাণ্ডার ক্রমাগত স্ফীতিলাভ করায় বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

এ সম্পর্কে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনবিষয়ক "ইনস্টিটিউটের সিনিয়র রিচার্স ফেলো মিঃ জুলিয়ান পেরী রবিনসন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি পেন্টাগনের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্নায়ু গ্যাসের (নার্ভ গ্যাস) প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে কিংবা রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের আধুনিকীকরণ কর্মসূচী কার্যকর করতে চায় তাহলে এটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশগুলিতে স্নায়ু গ্যাসের উৎপাদনবৃদ্ধির বিপদকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমেরিকার পূর্ব ঘোষিত নীতির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান কার্যকলাপের মধ্যে একটা মৌলিক অসঙ্গতি লক্ষণীয়।

মার্কিন প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে যে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে তাতে গোটা পৃথিবীটাই উড়িয়ে দেওয়া যায়। প্রাক্তন বিমান অ্যাডমিরাল জেনারেল আর এ কক পরিচালিত এক বেসরকারী সংস্থার হিসাবে, মার্কিন ভাণ্ডারে মোট ত্রিশ হাজার পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। এর মধ্যে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে পনের হাজার বাকিটা ছড়িয়ে রয়েছে য়ুরোপ, এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে। তাদের প্রতি-রক্ষণের সঙ্গে একটি মানচিত্র প্রকাশ করে কোথায় কত পরিমাণ অস্ত্র রয়েছে তারও অবস্থান দেখান হয়েছে। এ সম্পর্কে পেন্টাগনের এক মুখপাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে গোপনীয়তা পালনই তাঁদের নীতি।

প্রকাশ গত চার বছর ধরে গড়ে দৈনিক তিনটি করে পরমাণু অস্ত্র সেখানে তৈরী হয়।

বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অস্ত্রবিক্রির প্রতিযোগিতা বেশ কিছু কাল যাবতই ক্রমবর্ধমান। ১৯৬১ খৃঃ থেকে ১৯৭৪ খৃঃ মধ্যে বিক্রির পরিমাণ বেড়ে যায় নয় গুণ, অর্থাৎ শনের শত মিলিঅন ডলার থেকে তের হাজার চার শত মিলিঅন ডলারে।

অস্ত্র রপ্তানীতে আমেরিকা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সর্বাগ্রে। ১৯৭৪ খৃঃ অস্ত্র বিক্রি করেছিল একশত ছত্রিশটি রাষ্ট্রে। ১৯৬১ খৃঃ থেকে ১৯৭৪ খৃঃ মধ্যে অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ এক হাজার মিলিঅন ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়ায় আট হাজার তিনশত মিলিঅন ডলার। ১৯৭৫ খৃঃ আমেরিকা নয় হাজার একশত মিলিঅন ডলারের বেশি অস্ত্র বিক্রি করে; অর্থাৎ বিগত বছরের থেকে ১৬ শতাংশ বেশী। ফরাসী এবং ব্রিটিশদের অস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৭৪ খৃঃ ছিল যথাক্রমে পঁয়ত্রিশ ও আঠার শতাংশ। পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশগুলির অস্ত্র রপ্তানী আমেরিকার অনুপাতে উনষাট শতাংশ কম ছিল।

১৯৭৪ খৃঃ যে দশ বছর শেষ হয়, সেসময়ে আমেরিকা বাইশ হাজার আটশত মিলিঅন ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি করে; যার ছেচল্লিশ শতাংশ যায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এবং ছত্রিশ শতাংশ পায় পশ্চিম য়ুরোপ (চৌত্রিশ শতাংশ পায় ন্যাটো সদস্য য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলি)। আমেরিকার অস্ত্র সব থেকে বেশী পরিমাণে পায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল সরকার (৩,২০০ মিলিঅন ডলার), দক্ষিণকোরিয়া (১,৯০০ মিলিঅন ডলার) এবং তাইওয়ান (১,৩০০ মিলিঅন ডলার)। জাপান এবং ইরাণ প্রত্যেকে পাঁচশত মিলিঅন ডলারের বেশী খরচ করে মার্কিন অস্ত্র ক্রয়ে এবং থাইল্যাণ্ডের পরিমাণ ছিল চারশত মিলিঅন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের য়ুরোপীয় ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মার্কিন অস্ত্রের সব থেকে বড় ক্রেতা হল পশ্চিম জার্মানী (২,১০০ মিলিঅন ডলার), তুরস্ক (১,৬০০ মিলিঅন ডলার), ব্রিটেন (১,২০০ মিলিঅন ডলার), গ্রীস (৯০০ মিলিঅন ডলার) এবং ইতালি (৮০০ মিলিঅন ডলার)। ন্যাটো সদস্য দেশগুলির কাছে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির মধ্যে এরাই ক্রয় করে ৮০·৫ শতাংশ; এই সঙ্গে আছে কানাডা (চারশত মিলিঅন ডলার)।

মার্কিন অস্ত্র রপ্তানী ক্ষেত্রে ১৯৫০ খৃঃ শেষে এবং ১৯৭০ খৃঃ প্রথমে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত মার্কিন অস্ত্র রপ্তানীর বৃহৎ অংশ ন্যাটো দেশগুলিতে বিক্রির পরিবর্তে যেতে থাকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে; দ্বিতীয়ত শেষের দেশগুলিতে অত্যাধুনিক মরণাস্ত্র পাঠাতে থাকে আমেরিকা। ওপরে

উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে উন্নত দেশগুলির অনুপাতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দ্বিগুণ অস্ত্র বিক্রি করা হয়েছিল।

মার্কিন অস্ত্র রপ্তানী উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৃদ্ধি পায় ১৯৭৫ খৃঃ; এবং রপ্তানী কেন্দ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে সরে গিয়ে দাঁড়ায় মধ্যপ্রাচ্যে। এই অঞ্চলে ইজরায়েলই সব থেকে বেশী পরিমাণ মার্কিন অস্ত্র পেতে থাকে।

বৃহত্তম মার্কিন অস্ত্র ক্রেতা

[মিলিয়ন ডলার হিসাবে ১৯৭৪ খৃঃ আর্থিক বছরে]

ইরান	৩,৮০০
ইজরায়েল	২,১০০
সৌদি আরব	৫৮৮
গ্রীস	৪৩৫
পশ্চিম জার্মানী	২১৯
স্পেন	১৪৮
কানাডা	৯৪
দক্ষিণ কোরিয়া	৮১
তাইওয়ান	৬৮
চিলি	৬৮

মধ্যপ্রাচ্য সংঘর্ষে জড়িত নয়, এমন কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্র ক্রয়ে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিয়ে থাকে। ১৯৭৪ খৃঃ পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি চার হাজার চারশত মিলিয়ন ডলার অস্ত্র ক্রয় করে; ১৯৫০-৬৯ খৃঃ অনুপাতে পাঁচগুণ বেশী। বড় অর্ডার আসে ইরান ও সৌদি আরব থেকে। কুয়াতেত কেনে আঠার মিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন অস্ত্র। পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে তিন হাজার তিনশত সত্তর মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি সই হয়েছিল আমেরিকা ১৯৭১ খৃঃ। এরমধ্যে ইরানের ছিল এক হাজার নয়শত পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন এবং সৌদি আরবের ছিল এক হাজার একশত দুই মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহের অর্ডার। কুয়াতেত মার্কিন অস্ত্র ক্রয় পরিমাণ বাড়িয়ে করে তিনশত বত্রিশ মিলিয়ন ডলার। ওমানও এই অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে (একহাজার ছয়শত মিলিয়ন ডলার। পারস্য

উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি ১৯৭৪ খৃঃ ফ্রান্স (পনেরশত মিলিঅন ডলার) এবং ব্রিটেন (পঞ্চাশ মিলিঅন ডলার) থেকেও অস্ত্র কেনে।

তেল থেকে মুনাফা বেড়ে যাওয়ায় পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি অত্যাধুনিক অস্ত্র সংগ্রহে মনোযোগ দিয়েছে। ইরানের সেনাবাহিনীতে আছে একশত আটত্রিশটি ফ্যানটম এফ ৪ বোমারু বিমান এবং ১৯৭৬ খৃঃ এর সঙ্গে যুক্ত হবে আশিটি এফ-১৪ সুইং-উইং জঙ্গী বিমান। তাছাড়া ইরানের আছে টিওডব্লু ট্যাঙ্কধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র এবং হক ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নত সংস্করণ। তাছাড়া ইরান সংগ্রহ করছে মার্কিন ডি ডি-৯৬৩ ডেস্ট্রয়ার, ব্রিটিশ চিয়াটেন ট্যাঙ্ক এবং কুয়াতের আছে ফরাসী মিরেজ জঙ্গী বিমান।

আমেরিকা ১৯৬৭ খৃঃ থেকে ১৯৭১ খৃঃ থেকে ১৯৭১ খৃঃ এই পাঁচ বছরে চার হাজারেরও বেশী বিমান (এর মধ্যে একহাজার অত্যাধুনিক বিমান), প্রায় চার হাজার যুদ্ধ সরঞ্জাম, চৌদ্দহাজার পাঁচশত ট্যাঙ্ক, একশত যুদ্ধ জাহাজ এবং দশহাজার ক্ষুদ্র অস্ত্র বিক্রি করে। তাছাড়া আমেরিকা ১৯৬০ খৃঃ ব্রিটেনকে একহাজার ডলারের বেশী দামের একশ দুইটি আন্তর্মহাদেশীয় কোলারীল ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে। নর্থরুপ এফ ৫ ই জঙ্গী বিমান একমাত্র রপ্তানীর জন্য উৎপাদিত হচ্ছে। এই বিমান সাতশত বিদেশে সরবরাহ করা হয়েছে যার দাম পনেরশত মিলিঅন ডলার। সর্বশেষ, সাড়াজাগান খবর হল জেনারেল ডাইনামিকস দুইহাজার মিলিঅন ডলার মূল্যের তিনশত আটচল্লিশটি এফ-১৬ জঙ্গী বোমারু সরবরাহ করবে ন্যাটো সদস্য বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ডেনমার্ক এবং নরওয়ে-কে।

অস্ত্র বিক্রয় করে আমেরিকা ক্রেতা দেশগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও, সেসব দেশে উপদেষ্টাও সেনাবাহিনীর লোক পাঠান হচ্ছে। ইরান ও সৌদি আরবে ১৯৭৫ খৃঃ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে একহাজার চারশত বাইশ এবং তিনশত একাশি স্পেয়ার পার্টসের জন্যও এইসব দেশকে আমেরিকার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে। আর এরই সুযোগে সেসব দেশের মাটিতে গড়ে উঠছে মার্কিন ঘাঁটি এর ফলে ঐসব রাষ্ট্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুনঃ প্রবেশ ঘটছে।*

নিউইয়র্ক টাইমস-এর খবরে প্রকাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমেরিকা ১০৬টি দেশকে মোট ৮০,০০০ কোটি টাকার অস্ত্র বিক্রি

* ইকনমিস্ট ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ১৯৭৫ (১১)।

করছে। আমেরিকাকে বাদ দিলে সারা বিশ্বের যা অস্ত্র আমেরিকা ঠিক সেই পরিমাণ অস্ত্র বিক্রী করেছে। মধ্য আমেরিকার জঙ্গল পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমি, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং এশিয়ার মালভূমিতে সব যুদ্ধই মূলত মার্কিন অস্ত্রে হয়ে আসছে। এই অস্ত্র বিক্রির টাকায় মার্কিন শ্রমিকরা মজুরী পেয়েছেন, মার্কিন কর্পোরেশন পেয়েছে মুনাফা।

এই অস্ত্রই দেশে দেশে ডিকটেটরদের টিঁকিয়ে রেখেছে, সেই ডিকটেটররাই আমেরিকার বিশ্বস্ত হয়ে এবং প্রেসিডেন্টও বোমোটি কংগ্রেসের অনুমোদনে মার্কিন অস্ত্র বার দিয়ে বা বিক্রি করে অন্য ডিকটেটরদের মদত দিয়েছে।

আমেরিকায় সরকারী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ কারখানার সংখ্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায়না। একটি পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায় ১৯৬০ খৃঃ প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীনে একশত বত্রিশটি শিল্পসংস্থা ছিল, যাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৭,৪৪০·৩ মিলিয়ন ডলার। এর কয়েকটি প্রতিরক্ষা দপ্তর নিয়ন্ত্রিত, এবং কয়েকটি বেসরকারী সংস্থাকে লীজ দেওয়া। এই সংস্থাগুলি নিম্নলিখিত সামরিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে :

উৎপাদন	নির্মাণকারী সংস্থা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন ডলার)
বিমান এবং ইঞ্জিন	২৯	৮৮১·৬
ক্ষেপণাস্ত্র ও বিস্ফোরক	৫০	২,৪৬৩·৩
ভারী অস্ত্র সজ্জিত সাঁজোয়া গাড়ি, কামান বন্দুক, ও ছোট অস্ত্র	১৮	৬৯৪.৫
ক্ষেপণাস্ত্র	১১	৬৪৭.২
জাহাজ নির্মাণ ও সংস্কার	২১	১,৬২২·০
ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি	১০	৭১·৪
অন্যান্য	৪৩	১,০৫০·০
মোট	১২০	৭,৪৪০·৩

বর্তমানে সরকারী অস্ত্রনির্মাণ কারখানাগুলির সংখ্যা, হ্রাস পাওয়ার কারণ, প্রতিরক্ষা দপ্তর বিগত কয়েক বছরে তাদের অনেকটি বিক্রি করে দিয়েছে।

সামরিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার সাধারণত অর্থিত গোলাবারুদ ও

উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক উৎপাদনে, জাহাজ নির্মাণ ও সারানোর কাজে এবং কামান বন্দুক ও ছোট অস্ত্র নির্মাণে।

সরকারী কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ প্রকাশ করা হয় না।

সাধারণত বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, মহাকাশ, রেডিও ইলেকট্রনিক এবং অন্যান্য প্রধান পর্যায়ের আধুনিক সামরিক অস্ত্র নির্মাণ করে বেসরকারী সংস্থা। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে বেসরকারী সংস্থাগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বোঝা যাবে ১৯৫০ খৃঃ ১ জুলাই থেকে ১৯৬০ খৃঃ ৩০ জুন এই দশ বছরে সরকারী সামরিক উৎপাদনের নব্বই শতাংশ কনট্রাক্ট পায় বেসরকারী মার্কিন সংস্থা, ছয় শতাংশ পায় বিদেশী ও বিদেশে কর্মরত মার্কিন সংস্থা, দুই শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও অ-মুনাফা অর্জনকারী কর্পোরেশন এবং দুই শতাংশ সরকারী সামরিক সংস্থা।

বেসরকারী সংস্থাগুলি কেবলমাত্র অস্ত্র নির্মাণই করে না, সামরিক নির্মাণকার্য সংগঠিত করে, গবেষণা ও উন্নয়নকার্য পরিচালনা করে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের গবেষণা ইনস্টিটিউট খুব কম পরিমাণেই সামরিক গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ চালায়। এখানে সাধারণত 'মৌলিক গবেষণা' এবং 'আবিষ্কারমূলক উন্নয়ন'-এর কাজ চলে। স্থল, নৌ-ও বিমানবাহিনীর, অধীনে বিভিন্ন ল্যাবরেটরি, গবেষণা কেন্দ্র ও অস্ত্র কারখানায় এই কাজ চলে।

আমেরিকার হাজার খানেকের বেশি মোটর, সেলাইকল এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদক সংস্থা অস্ত্র তৈরি ও রপ্তানি করে আয় বৃদ্ধি করছে। তেল কোম্পানিও এ থেকে বাদ যায়নি। অস্ত্র তৈরি ও রপ্তানির ব্যাপারটি বর্তমানে বেশ লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, মার্কিন সরকারের যা আইন রয়েছে, তাতে ঐ কারখানাগুলির পক্ষে অস্ত্র ব্যবসায় মেতে উঠতেও কোন বাধা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়, না, অর্থ নির্মাণের কারখানা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক-শিল্পের একচেটিয়া কারবারগুলি, ওয়াশিংটনের সর্বোচ্চ সামরিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে কাজ করছে, তারা শুধু রাজকোষের টাকা নির্লজ্জের মত লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, সেনেটর ইউজিন ম্যাকার্থির মতে, সেটা হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতিতে ও দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও চাপসৃষ্টি।

মার্কিন বিজ্ঞান গবেষণার সামরিকীকরণ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। ১৯৬৮ খৃঃ বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বরাদ্দ আঠাশ মিলিঅন ডলারের সবটাই ব্যয় করা হয়েছিল সামরিক গবেষণায়। বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের অধিকাংশই যেকোনভাবেই সামরিক শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত। মার্কিন সাংবাদিক জে. রিঙওয়ে বলেছেন যে সামরিক বিভাগের অধিকাংশ গবেষণা কাজ চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। ষোলটি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত প্রাক্তন কর্মীরা পেন্টাগনের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে কাজ করে। সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের বিকাশের জন্য মার্কিন পুঁজিপতিরা মাত্রাতিরিক্ত বেতনের বিনিময়ে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ করছে।

মার্কিন অধ্যাপক সেমুর মেলমানের 'পেন্টাগন ক্যাপিটালিজম. দি পলিটিক্যাল ইকনমি অফ ওয়ার গ্রন্থ থেকে জানা যায় : ১৯৬৮ খৃঃ পেন্টাগনের অর্ডার পায় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি একশত উনিশ মিলিঅন ডলার, জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় সাতান্ন মিলিঅন ডলার, কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সত্তের মিলিঅন ডলার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নয় মিলিঅন ডলার, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছয় মিলিঅন ডলার। আমেরিকা শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিয়ে প্রতিরক্ষা দপ্তরের চুক্তি অনুসারে কাজ করতে। বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার সামরিকীকরণ ক্রমবর্ধমান। বহু ছাত্র, শিক্ষক এবং বিজ্ঞানী আমেরিকার বিজ্ঞানকে যুদ্ধনির্ভর করে তোলার বিরোধিতা করছে।

বৃহৎ সামরিক কনট্রাক্টর এবং বৃহৎ শিল্প কর্পোরেশনের গড় লভ্যাংশের পরিমাণ

	১৯৫৭	১৯৬০	১৯৬২	১৯৬৪	১৯৬৫	১৯৬৭
পনেরটি বৃহৎ সামরিক কনট্রাক্টর···	১৭·২	১১·০	১৩·১	১৩·৯	১৮·২	১৫·০
পাঁচশত বৃহৎ শিল্প কর্পোরেশন·····	১১·৪	৯·১	৮·৯	১০·৫	১১·৮	১১·৭

মার্কিন বিজ্ঞানীদের একাংশ মার্কিন সরকারের সামরিক জুয়াখেলা নীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে শুরু করেন বেশ কিছুকাল আগেই। দেশীয়

বিজ্ঞানী ও কৃতীছাত্রদের এইসব মানববিদ্বেষী কাজে সহায়ক হিসাবে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সেই অবস্থায় পেন্টাগনের 'মগজ লেনদেন কেন্দ্রগুলিতে বিদেশী বিজ্ঞানীরাই ক্রমে বেশী করে ভিড় করছেন। মার্কিন 'সামরিক-বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার' কর্তৃক বিদেশী বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের এই প্রক্রিয়া ক্রমেই বেড়ে উঠছে। শুধু ১৯৬৭ খৃঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে একচল্লিশ হাজার ছয়শত বাহান্নজন বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিশেষজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়। মার্কিন সমরবাদীদের পক্ষে কাজ করার জন্য এদের মধ্যে যেন কয়েকজনকে তাড়া করা হয়। বিশেষজ্ঞরা অনেক সময়ই এ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতে পারেন না। কারণ বেশির ভাগ সময়েই বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিশেষজ্ঞদের প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মী রিক্রুটিং অফিসাররা নিযুক্ত করে না, এরা নিযুক্ত হন রাষ্ট্রতত্ত্বাসিত গবেষণা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে। এই কেন্দ্রগুলি তাদের 'অসামরিক' মর্যাদা নিয়ে যে সমস্ত বিজ্ঞানী পেন্টাগনের সঙ্গে প্রকাশ্য সহযোগিতা এড়িয়ে চলেন তাদের আকর্ষণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের উপদেষ্টা ও অনিয়মিত কর্মী হিসাবে নিয়োগ করে এইসব কেন্দ্র। এরাই সামরিক গবেষণাসংক্রান্ত বিভিন্ন কনট্রাক্টের জন্য কর্মী নির্বাচন ও সুপারিশ করে। অধ্যাপকদের সঙ্গে জেনারেলদের দেখা সাক্ষাতের জন্য একটা 'নিরপেক্ষ' আবহাওয়া প্রতিষ্ঠাও এদের লক্ষ্য। 'পেন্টাগন-বিশ্ব-বিদ্যালয়' সমাচারের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে এই ধরনের রাষ্ট্রতত্ত্বাসিত গবেষণাকেন্দ্রগুলি। সমরবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপারে 'ঠাণ্ডা লড়াইটা' ছিল একটা জোরালো উদ্দীপক বস্তু। সেই সঙ্গে, বিজ্ঞানী ও ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতার পথে যে নৈতিক বাধা দেখা দিয়েছিল তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মার্কিন সমর বিভাগ ম্যাকার্থিবাদ ও কমিউনিস্ট বিরোধী উন্মাদনাকে ব্যবহার করেছিল। বস্তুতপক্ষে এই অবস্থাতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল পেন্টাগনের নির্দেশ অনুযায়ী কর্মরত কতকগুলি গবেষণা-কেন্দ্র 'সামরিক-বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার'। মার্কিন গবেষক মাইকেল ক্লেরাবের ভাষায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিণত হয়েছে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর বিভাগের চতুর্থ বাহুতে'—যেগুলি ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমানবিক বোমা তৈরি করতে পারত না, আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে পারত না, ভিয়েতনামে গেরিলাবাহিনীগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের রণনীতি প্রণয়ন করতে পারত না।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করনেল বিশ্ব-

বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল অধ্যাপক আইল্যাণ্ডের একটি প্রদেশে গবেষণা করছিলেন প্রাচীন দার্শনিকদের পাণ্ডুলিপি, অতীতের শিল্প নিদর্শন অনুসন্ধান করতে গিয়ে মার্কিন বিজ্ঞানীরা একটি ছোট গ্রামে পৌঁছান। সেখানে কোন কাজে কোন গবেষক পদার্পণ করেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তারা সেখানে কয়েকজন সতীর্থের দেখা পেয়ে বিস্মিত হন। আরো আশ্চর্য হন সেই সঙ্গে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিমানবিদ্যাসংক্রান্ত ল্যাবরেটরির গবেষণাকর্মীদের দেখা পেয়ে। জানা গেল তাদের 'সতীর্থরা' পেন্টাগন ও সি আই এ-র প্রদত্ত দায়িত্ব অনুযায়ী 'কমিউনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কতকগুলি 'জোরদার ঘুঁটি' প্রতিষ্ঠা করছেন।

এমন কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয় এটা। আমেরিকার সামরিক-শিল্প সমাহারের এক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে, গোপন সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্ত মগজ ক্রয়ের এক বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

বর্তমানে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমরবাদীদের অন্যতম গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আর গত কয়েক বছরে মার্কিন ছাত্রদের বিদ্যায়তনে যুদ্ধ বিরোধীশক্তি পেন্টাগনের সঙ্গে সহযোগিতার অবসান ঘটাবার জন্য কাজ করছে। বহু সৎ মার্কিন বিজ্ঞানী পেন্টাগন আর সি আই এ-র জুয়াখেলায় জড়িত হতে চান না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৬৯ খৃঃ গোড়ার দিকে ম্যাসাচুসেট্স টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিট্যুটের একদল বিজ্ঞানী যুদ্ধের স্বার্থে মার্কিন সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কৃতিত্বগুলিকে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ ইশ্তেহার প্রকাশ করেন। ইশ্তেহারের এক জায়গায় বলা হয়: "বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অপব্যবহারই মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে বড় বিপদ। ভিয়েতনামে তার কার্যকলাপের দ্বারা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞজনোচিত ও মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের আস্থাকে দুর্বল করে তুলেছে।" এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানান বহু মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী ও স্নাতকোত্তর ছাত্র।

ফল হয় সুদূরপ্রসারী। এই সমস্ত প্রতিবাদের জবাবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানরা সামরিক গবেষণা সংক্রান্ত কনট্রাক্টগুলি সংশোধনের কথা জানান। তাসত্ত্বেও 'দ্য ক্লোজড কর্পোরেশন। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ইন ক্রাইসিস' গ্রন্থের লেখক জেমস্ রিজওয়ের বক্তব্য অনুযায়ী—বিশ্ববিদ্যালয়

গুলি এবারে সমাজের কাছ থেকে গোপনে—সময় বিভাগের দেওয়া অর্ডার মাফিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ; সম্ভবত আগের চেয়ে বহুগুণ হারেই ।

সামরিক বিশ্ববিদ্যালয় সমাহারে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাস্তব ভূমিকা কি ? দেশের ত্রিশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর প্রায় বিশ হাজার মিলিটারি অফিসার পাশ করে বেরোয় । স্থলবাহিনী শতকরা পঞ্চাশ, নৌ-বাহিনীর শতকরা পঁয়ত্রিশ এবং বিমানবাহিনীর শতকরা ত্রিশ ভাগ চাহিদা মেটায় এইসব অফিসার । কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা করে নতুন নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক যন্ত্রপাতির বিকাশ নিয়ে—মার্কিন সামরিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'কড়া মালমশলা' । এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে মেরিল্যাণ্ডের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় । এখানকার ফলিত পদার্থবিদ্যার ল্যাবরেটরিতে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার উন্নততর বিকাশ এবং ক্ষেপণাস্ত্রের জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা চালান হয় । এই ল্যাবরেটরিতেই রচিত হয়েছিল অস্কার কৃত্রিম উপগ্রহের প্রকল্প । ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ওপর বোমাবর্ষণ-কারী মার্কিন নৌবহরের পাইলটরা এই উপগ্রহ ব্যবহার করেছিল নৌচলাচলের উদ্দেশ্যে ।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যাপৃত 'নরম মালমশলা' উৎপাদনের ব্যাপারে । অর্থাৎ সমর ক্রীড়ার নানান ব্যবস্থাও তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে এবং 'মানবিক উৎপাদন' নিয়ে সর্বাত্মক অধ্যয়ন চালায় । পেন্টাগনের মতে ইলেকট্রিক কমপিউটারের সাহায্যে মানবিক উপাদান সম্পর্কে অনুসন্ধান, সামরিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা কেন্দ্রগুলির 'একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ' যুদ্ধোত্তর কৃতিত্ব । এই গবেষণার ফলাফল সি আই এ ব্যবহার করে ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ফলিত সামরিক গবেষণার জন্য স্বায়ত্তশাসিত কেন্দ্রও দেখা দিচ্ছে । ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে লরেন্স রেডিয়েশন ল্যাবরেটরি, লস এঞ্জেলসে আছে পারমানবিক সমস্যা বিষয়ক গবেষণার ল্যাবরেটরি । প্রথম পারমাণবিক বোমাটি তৈরি হয়েছিল এখানেই । এই দুটি ল্যাবরেটরিতে কর্মীর সংখ্যা প্রায় বার হাজার । হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান কৃতিত্ব নৃশংসতম নাপাম বোমা আবিষ্কার ও তার বিকাশসাধন ।

মার্কিন রাজধানীতে অবস্থিত জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কাজই হল 'নরম মালমশলার' বিকাশ ঘটানো । প্রথমটি কাজ চালাচ্ছে তার 'মানব সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ব্যুরো'তে । এর

প্রধান লক্ষ্য 'হত্যার বিজ্ঞান' সম্পর্কিত গবেষণা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে 'মানুষের নিশ্চিহ্ন করণের সর্বোচ্চ শক্তির' সমস্যা নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা চলে এবং 'শত্রু নিধনের দ্রুততম উপায়' সম্পর্কে গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ করা হয়।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সামাজিক তৎপরতা বিষয়ক অনুসন্ধান ব্যুরো' এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিকাশশীল দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান বৈজ্ঞানিকভাবে সংগঠিত করার ব্যাপারে শিক্ষা-দান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই ব্যুরোর সুপারিশ ব্যবহৃত হয়েছিল ক্যামেলটের তৎপরতার প্রস্তুতি চালাবার উদ্দেশ্যে। ১৯৬৫ খৃঃ চিলিতে এই তৎপরতা চালিয়েছিল সি আই এ। অন্যান্য লাতিন আমেরিকান দেশগুলিতে এই একই তৎপরতা চালান হয় অন্য নামে—সিমপার্টিকো, জব-৪৩০ প্রভৃতি। এই ধরনের কার্যকলাপ বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অবদান রেখেছে ম্যাসাচুসেটস টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ক্যালিফোর্নিয়া প্রিন্সটন ও মিশিগান বিশ্ব-বিদ্যালয়। ক্যামেলট ধরনের তৎপরতা চালাবার সময়ে সি আই এ-এর চরেরা এইসব দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত এমন লোকজনকে খুঁজে বের করে। যাদের নিশ্চিহ্ন করা দরকার এমন প্রগতিশীল ব্যক্তিদের 'ব্লাকলিস্ট' তৈরি করে। মার্কিনদের দ্বারা বিশেষভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে নতুন সরকারে তারা প্রধান প্রধান পদ দখল করতে পারে।

ক্যামেলট তৎপরতা ও অন্যান্য অনুরূপ প্রকল্পের প্রকৃত অর্থ লাতিন আমেরিকান দেশগুলির জনসাধারণের কাছে ধরা পড়ে যায়। তখন 'সামাজিক তৎপরতা বিষয়ক অনুসন্ধান ব্যুরো'র পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে নতুন নামকরণ করা হয়—'সামাজিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র।' ফরাসি সংবাদপত্র লা মঁদে-র খবর অনুযায়ী এই কেন্দ্রটিকে ১৯৭০ খৃঃ নিয়ে আসা হয় পিটার্সবার্গ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্তাদের অধীনে। সম্প্রতি এই কেন্দ্রটি বহু বিচিত্র ধরনের কাজকর্মে ব্যাপৃত আছে। এই প্রতিষ্ঠানে পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গেরিলা বিরোধী তৎপরতার রণকৌশল রচনা করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত মার্কিন সামরিক ব্যক্তিদের তৎপরতার কার্যকরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গবেষণা চালায়; পেন্টাগনের পক্ষ থেকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ সম্পর্কে আকরগ্রন্থ প্রকাশ করে।

ইলিনোয়া প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের 'বৈজ্ঞানিক

কাজকর্মের ক্ষেত্রটিও বিচিত্র। এই কেন্দ্রটি 'বিজ্ঞানের' ক্ষেত্রে বৃহত্তম অবদান রেখেছে পেন্টাগনের নির্দেশ মাফিক নতুন ধরনের রাসায়নিক ও জীববিদ্যাগত অস্ত্রের বিকাশ ঘটিয়ে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের পরম দাক্ষিণ্যপুর্ব কনট্রাক্টের কল্যাণে এই ইনস্টিটিউট 'বায়ু জীববিদ্যা' সম্পর্কে অনুসন্ধানকর্মের প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। 'বায়ু জীববিদ্যা' বলতে বোঝায় এমন কোন বাহকের বিকাশ ও প্রবর্তন যা হাওয়ায় সংক্রামক রোগের উৎস বহনে সক্ষম। তাই এই ইনস্টিটিউটের বাজেট বরাদ্দের অর্ধেকই (বরাদ্দের পরিমাণ বছরের ২৮০০ কোটি ডলারেরও বেশি) পড়ে পেন্টাগনের কনট্রাক্ট খাতে।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক আয় ছয় কোটি ডলার। এই অর্থের অর্ধেকই আসে সামরিক কনট্রাক্ট বাবদ। পেন্টাগনের অর্ডার মাফিক ইনস্টিটিউটের গবেষণা বিষয় হল: 'কঠিন তরল রাসায়নিক ও জীববিদ্যাগত নিয়ুক্তকের (এজেন্ট) প্রসার সম্পর্কে গবেষণা; 'নৌঅভিযাত্রী বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভটলজ সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি। ইনস্টিটিউটের কর্মীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিননীতির সামরিক জুয়া খেলায় 'বৈজ্ঞানিক' অবদান যোগাবার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। মার্কিন নৌবিভাগের স্বার্থে তারা মেকং বদ্বীপ এলাকায় গোপন অনুসন্ধান চালিয়ে জঙ্গলে সেনাবাহিনীর রণক্ষেত্রের রেডিও স্টেশনগুলির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির অবস্থা পর্যালোচনা করেছে। ইনস্টিটিউটের পঞ্চাশজন কর্মীকে ব্যাংককে থাই-মার্কিন সামরিক গবেষণা কেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান হয়। সেখানে গেরিলাবিরোধী যুদ্ধের বিভিন্ন পদ্ধতির বিকাশ ঘটান হয়।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব গবেষণা চলছে তার তিনভাগের দুভাগের জন্য অর্থ যোগায় মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ, আনবিকশক্তি কমিশন এবং নাসা (ন্যাশনাল অ্যারোনেটিকস অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিসট্রেশন)।
- এগারটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় মার্কিন সেনাবিভাগের রাসায়নিক শাখার সহযোগিতায় বিষাক্ত গ্যাস সম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছে পাকাপাকিভাবে। এদের মধ্যে আছে ইউনিভার্সিটি অফ টেকসাস, স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং কর্ণেল অ্যারোনেটিকস ল্যাবরেটরি।

- দেশের আটটি বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় পেন্টাগনের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে বীজাণু অস্ত্র সম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছে।
- ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী ও ইজরায়েলের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পেন্টাগনের সাহায্য পায় নরহত্যা সম্পর্কিত গবেষণার জন্য।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য কাকে বলে ?

রণধীর দাশগুপ্ত

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের অর্থ কি ? এই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ? বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য বা ফ্রন্ট শ্রেণী-নিরপেক্ষ ফ্রন্ট নয়, শ্রেণী নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীও নয়। অথবা কয়েকটা পার্টি ও প্রগতিশীল ব্যক্তির সমন্বয়ও নয়। যে ঐক্য প্রধানত শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ এবং মধ্যবিত্তের সমর্থন ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না, শোষিত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে আবির্ভূত হয় না, গণতান্ত্রিক লক্ষ্য সাধনে বিপুল জনসাধারণকে সংগ্রামে পরিচালিত করে না এবং একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে জাতীয় ও শ্রেণীস্বার্থের দিকে তাকিয়ে বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয় সাধন করতে পারে না, সেই ঐক্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের ঐক্য হলেও বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য নয়। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রেণী সমাবেশই হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের মূল বিষয়বস্তু। কয়েকটি পার্টির কয়েকজন নেতার মধ্যে আলোচনা বা ঐক্যমতকে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য বলা যায় না। বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য হচ্ছে বিশেষ ধরনের শ্রেণী-সমাবেশ, সংগ্রামের হাতিয়ার, সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনেরও হাতিয়ার। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিভিন্ন মতাদর্শ থাকতে পারে। এই ঐক্যের মধ্যে যে সব শ্রেণীর সমাবেশ হবে সেই সব শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাও এক নয়। সকলে একই ধরনের দৃঢ়তা নিয়েও অগ্রসর হবে না। মনে রাখতে হবে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের মূল শক্তি হচ্ছে নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ। দেশে এমন অনেক পার্টি আছে যাদের প্রতি নিপীড়িত মানুষের কোন সমর্থন নেই সেই সমস্ত পার্টির ওপর ঐক্যের ছাপ মারলেই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য হয় না। সংগ্রামের মধ্যেই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের উৎস। সংগ্রাম থেকেই সেই ঐক্য শক্তি সঞ্চয় করে। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সাময়িক নয়, বিপ্লবের স্তর এবং কর্মনীতির অনুকূল শক্তির সমাবেশ হয় এই ফ্রন্টে। অতএব এটা নিছক নির্বাচনী হাতিয়ার নয়, এটা বিপ্লবেরও হাতিয়ার।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের পরিপন্থী তত্ত্ব

কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন কংগ্রেস-কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যই হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা ঐক্য। এঁদের তত্ত্ব হচ্ছে—"Left we are, democrats they are." অর্থাৎ "বাম আমরা, গণতন্ত্রী তারা," এঁদের মতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের যোগফল হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিকঐক্য। বিগত লোকসভা নির্বাচনে এই তত্ত্ব একেবারে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে।

এই তত্ত্ব একদিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন আর অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ। এর অর্থ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া দেশে আর বামপন্থী নেই। অন্যদিকে কংগ্রেসই হচ্ছে গণতন্ত্রের একমাত্র প্রতিভূ। এ তত্ত্ব হচ্ছে বাম ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের মিলন ক্ষেত্র। এর মধ্যে নিপীড়িত শ্রেণীর কোন দৃষ্টিভঙ্গী নেই। কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বাঙ্গীন ঐক্যের অর্থই হচ্ছে গোটা বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে ঐক্য। এর আরও অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র বুর্জোয়া-শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত করা এবং নিজেরাও বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে মোহের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে থাকা।

এই তত্ত্ব বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর স্থলাভিষিক্ত করেছে। এর পরিণাম হচ্ছে : জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা অস্বীকার, এতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র ভূমিকাও নেই এবং কৃষকসমাজের কোন ভূমিকাই নেই। অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী মুখ্যশক্তি নয়, মুখ্যশক্তি হল বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য। এই তত্ত্ব বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভিত্তি হতে পারে না। সংগ্রামের ভিত্তিও এটা নয়। এটা হচ্ছে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ঐক্যকে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বলে জাহির করার অপপ্রয়াস। বলা বাহুল্য, এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় স্থলে অবস্থান করছে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা।

রুশদেশে ১৯০৫ সালের বিপ্লব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-শ্রেণীর ঐক্য যথেষ্ট মজবুত ছিল না বলে। ১৯১৭ সালের বিপ্লব সফল হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের ঐক্য সফল হয়েছিল বলেই। এটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও সত্য। কেবল বিপ্লবের ক্ষেত্রে নয়, নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বটে। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তরা যে ফ্রন্টকে সমর্থন করে সেই ফ্রন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। আর সংগ্রামের মধ্যে এই ঐক্য গড়ে উঠলে

সেই ঐক্যই হবে ভারতে ভবিষ্যতের পথনির্দেশক ও বৃহত্তম গণতান্ত্রিক শক্তি এবং এই শক্তিই দোদুল্যমান বুর্জোয়ার অংশ-বিশেষকে সঙ্গে রেখে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে। সশস্ত্র বিপ্লবে হোক, আর শান্তিপূর্ণভাবেই হোক, শ্রমিক কৃষকের ঐক্যই হচ্ছে নিয়ামক শক্তি। এই শক্তিকে বাদ দিয়ে বা এই ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্জন করে বা তাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করে কেউ কেউ বুর্জোয়াশ্রেণীকে নিয়ামক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

কোন্ শ্রেণীভিত্তি থেকে কাজ শুরু করব? কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ঐক্য থেকে? বুর্জোয়া-শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস থেকে? অথবা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী গড়ে তোলার প্রয়াস থেকে? সংস্কারবাদী চিন্তা হল প্রথমোক্ত দুই চিন্তাধারা থেকে। এই দুই চিন্তাধারা আসলে পরস্পর থেকে অবিচ্ছেদ্য, একে অন্যের পরিপূরক মাত্র। এ দুই চিন্তাধারার সত্তা এক ও অভিন্ন। শেষোক্ত চিন্তাধারা অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের ঐক্যের কথা তাঁরা ভাবেনও না। কারণ তাঁদের মতে দুই পার্টির (শ্রেণীর নয়) ঐক্য হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য বা ফ্রন্ট। এ সত্যও তাঁরা ভুলে গেছেন যে বিপ্লবের অগ্রগামী শ্রেণী ও তার মিত্র-শ্রেণীকে সংগঠিত না করলে প্রগতিশীল শক্তি যেখানেই তাদের অবস্থান হোক না কেন, তারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দি অতিক্রম করতে পারে না।

এই তাত্ত্বিকেরা এইটুকুতেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব হবে যৌথ নেতৃত্ব—শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়া-দের যৌথ নেতৃত্ব। এটা নাকি সৃজনশীল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং ভারতে বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য। যে শ্রেণী দোদুল্যমান এবং যার চরিত্র হচ্ছে দ্বৈত-চরিত্রসম্পন্ন ও যার দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা নেই, যারা শ্রমিক-কৃষককে শোষণ করে, যার আশাআকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী-গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হওয়া—সেই শ্রেণীর অংশও কী করে বিপ্লবের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারে? বর্তমান যুগে যে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব সমস্ত রকম শোষণের বিরুদ্ধে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং যে বিপ্লবের গতিমুখ হচ্ছে সমাজ-তন্ত্রের দিকে সেই যুগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হলেও তারা সামাজিক বিরোধেরও বিরুদ্ধে। শ্রমিক-কৃষককে শোষণ করা তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও চরিত্র। বলা হয়ে থাকে যে বুর্জোয়াদের

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অংশকে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত না করলে তারা ফ্রন্টে আসবে কেন বা জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারে যোগ দেবে কেন? বুর্জোয়াদের একাংশ বিপ্লবের শক্তি সন্দেহ নেই, জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারেও তারা অংশগ্রহণ করবে কিন্তু নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে না। তারা অংশগ্রহণ করবে এই কারণে যে তারা একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাঁচতে চায় এবং যতদিন শোষক হিসেবে বাঁচা যায় ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল।

যৌথ নেতৃত্বের অর্থ হল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ঐতিহাসিক দিক থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সমান! উভয়েই সমভাবে অবিচল এবং এদের ভূমিকার মধ্যে কোন তারতম্য নেই! জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর মত সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ় মনোভাবাপন্ন, অবিচল ও অটল! সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরের নেতা "ইন্দিরা গান্ধী বিরামহীনভাবে প্রগতির দিকে অগ্রসর হবেন। তিনি আর পেছুতে পারবেন না। পেছনে হঠবার তাঁর আর কোন পথ নেই।" এই বক্তব্যে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় বুর্জোয়ারা একচরিত্রসম্পন্ন, দ্বৈতচরিত্রসম্পন্ন নয়। তারা বিরামহীন'ভাবে অবিচল, অটল ও দৃঢ়। অতএব শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়া একই সঙ্গে নেতৃত্বে অংশীদার হতে পারবে।

বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এমন স্লোগান কখনও উত্থাপন করেন নি। বস্তুতপক্ষে যৌথ নেতৃত্বের স্লোগান হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুগত করে রাখার স্লোগান। এটা হচ্ছে উদারনৈতিক বুর্জোয়া রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠার স্লোগান। এই স্লোগানের ভিত্তিতে কখনও বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠিত হতে পারে না বরং এই স্লোগান বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য বা ফ্রন্টের পরিপন্থী।

কংগ্রেস সরকারের ২০ দফা কর্মসূচীকে এই যৌথ নেতৃত্বের সমর্থনে ব্যবহার করা হয়েছে। এই কর্মসূচী খানিকটা প্রগতিশীল সন্দেহ নেই কিন্তু এটা হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর সংস্কারমূলক কর্মসূচী। উপরের তলা থেকে ভূমি সংস্কারের সঙ্গে নিচের তলা থেকে ভূমি সংস্কারের পার্থক্য আছে। অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হয়েছে যে এই সংস্কারমূলক কর্মসূচীও কংগ্রেস শাসক এবং আমলাতন্ত্রের দ্বারা কার্যকর করা যায় না। কংগ্রেস সরকারের কিছুটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা থাকলেও তা সামন্ততন্ত্রকে নির্মূল

করতে পারে নি। লক্ষ্য করা উচিত যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগেও কোন দেশেই বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রকে নির্মূল করে নি এবং করতেও পারে না। রুশ দেশে একমাত্র অক্টোবর বিপ্লবেই সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ একেবারে ধুয়ে-মুছে গেছে। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম হয় নি এবং হবে না। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের বিরোধ থাকলেও যখন কৃষকসমাজ এবং শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত শ্রেণী হিসেবে সামাজিক বিরোধের শক্তি হিসেবে দাঁড়ায় তখন বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততন্ত্রকে সংকুচিত করে, কৃষকদের কিঞ্চিৎ সুযোগ-সুবিধা দেয় বটে কিন্তু কৃষকের স্বার্থে সামন্ততন্ত্রকে বিলোপ করে না।

২০ দফা কর্মসূচী কৃষকের সর্বাঙ্গীন স্বার্থে সামন্ততন্ত্রকে নির্মূল করার কর্মসূচী নয়। যে-কৃষিবিপ্লবের পথে সামন্ততন্ত্রকে নির্মূল করা সম্ভব সেই কৃষি-বিপ্লবকে বুর্জোয়ারা ভয় পায়। এই কারণেই কৃষকদের উদ্যোগ ব্যাহত করে আমলাতন্ত্রই ছিল এই কর্মসূচী রূপায়ণের হাতিয়ার। ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে সামন্ততন্ত্রকে নির্মূল করা যায় না কারণ ব্যক্তি মালিকানায় সম্পত্তির বিলোপে যে বিপ্লবী শক্তির উন্মেষ ঘটবে সেই শক্তি ধনতন্ত্রকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করবে। কৃষি-বিপ্লব যেমন ধনতন্ত্রকে আঘাত করে তেমনই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কৃষি-বিপ্লবকে আরও অগ্রসর করে নেয়। শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী এই কারণে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রকে আঘাত করার মোক্ষম হাতিয়ার। এই কারণে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় মানে জাতীয় বুর্জোয়াদের জয় নয়। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থই হচ্ছে মূলত জনগণেরই বিপ্লব। সুতরাং বামমুখীন জনগণের ভূমিকা হল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বুর্জোয়ারা এটা বোঝে বলেই তাকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য সামন্ততন্ত্রকে কিছুটা পরিমাণে সংকুচিত করে তার স্থানে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এই ২০ দফা কর্মসূচীর সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায় তা গোপন রেখে ঢালাওভাবে তাকে প্রগতিশীল বলে আখ্যা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণীকে তার মুখ্য (!) ভূমিকার জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া এবং তার আরও অর্থ হচ্ছে "আমরা বাম, তারাই গণতন্ত্রী" এই তত্ত্বকে প্রতিপন্ন করা। বলা বাহুল্য, এই তত্ত্ব বিপ্লবী চেতনার মূলে ছুরিকাঘাত করে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করার পরিবর্তে উভয়কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকাকে ম্লান করে দিয়ে পার্টিকে বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত করে।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের স্লোগান কেবল শ্রেণীশক্তি সমাবেশ ও সংগ্রামের স্লোগান নয়, সরকার গঠনেরও স্লোগান। সংস্কারবাদীরা বলেন যে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের রাষ্ট্র হচ্ছে বহু শ্রেণীভিত্তিক এবং এই রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং জাতীয় বুর্জোয়ার একাংশের সম্মিলিত একনায়কত্ব। এর অর্থ কী? বহু শ্রেণীভিত্তিক একনায়কত্বের তত্ত্বের আড়ালে সরকারে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা এক ও সমপর্যায়-ভুক্ত এই বক্তব্যটি হাজির করা হয়েছে। এই ফ্রন্টে ও সরকারে বুর্জোয়া শ্রেণীর যা ভূমিকা তা শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা থেকে কোন অংশে কম নয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর যা ক্ষমতা শ্রমিক- কৃষকদেরও একই ক্ষমতা। পাতিবুর্জোয়ারা সমান অধিকারকে গণতন্ত্র বলে অভিহিত করে। উৎপাদন সম্পর্কে যে শ্রেণীর যে অবস্থান সেই শ্রেণী সেই অবস্থান থেকে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। একই সরকারে বুর্জোয়ারা ও শ্রমিকশ্রেণী অংশগ্রহণ করলেও বুর্জোয়ারা উৎপাদনী শক্তির মালিকানা বর্জন করে নি। এই শোষণ সম্পর্ক নিয়েও বৃহত্তর শোষণ সম্পর্কের বিরুদ্ধে তারা সরকারে অংশগ্রহণ করছে। সরকারে অংশগ্রহণ করে তারা স্বেচ্ছায় তাদের শ্রেণীস্বার্থ পরিত্যাগ করে না। শোষণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তারা সরকারকে প্রভাবিত করতে যে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব তারা শোষণের অনুকূলে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করবে এবং সরকারের অভ্যন্তরে কৃষকদের প্রভাবিত করবে এই বলে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎসাদন যেন এই সরকার করতে না পারে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কি দেশের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রেখে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অন্তত স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হবে। এটাই এই শ্রেণীর পক্ষে স্বাভাবিক।

বহু শ্রেণীভিত্তিক একনায়কত্বের পক্ষে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কিভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব? এই বহু শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্রে কী করে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সমপর্যায়ভুক্ত হবে? কী করে বা শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা রাষ্ট্রে অংশগ্রহণকারী বুর্জোয়াদের মত হতে পারে? সংস্কারবাদীরা আসলে চায় একনায়কত্বের এবং সমান অধিকারের আড়ালে বুর্জোয়ারা যেন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বুর্জোয়াদের সম্পর্কে এত মোহ ও প্রীতি কেন? বুর্জোয়াদের মুখ্য শক্তি করে রাখতে তাদের এত আগ্রহ কেন? কেবল তা নয় এরা কংগ্রেসকে নিয়েও সমাজতন্ত্রে পদার্পণ করতে চান। এর পরিণাম

হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে একটা উদারনৈতিক রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা যেখানে শ্রমিক-কৃষকেরা বুর্জোয়াদের অনুগত থেকে কিছুটা অধিকার ভোগ করবে।

এই সংস্কারবাদীরা বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের এমন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে সেই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যে বুর্জোয়াদের মুখ্য ভূমিকা থাকবে। এদের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বনাম গোটা জাতির মধ্যে বিরোধ হল মুখ্য ও একমাত্র বিরোধ। সামাজিক বিরোধ হল গৌণ এবং একটা মামুলি বিরোধ। এই বিরোধকে বুর্জোয়ারাই অনায়াসেই সমাধান করতে সক্ষম বলে সংস্কারবাদীরা মনে করেন। বলা বাহুল্য এ সব তত্ত্বকে বর্জন করার পরিবর্তে তাকে আলিঙ্গন করে থাকলে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সম্ভাবনায় কুঠারাঘাত করা হবে।

জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে লেনিন

জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা থাকলে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠন সম্ভব নয়। এ সত্যকে আজ আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ভ্রান্ত মূল্যায়ন বারবার কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা থাকলেও তারা নয়া ঔপনিবেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারে না বা বিদেশী পুঁজিকে সামগ্রিকভাবে জাতীয়করণ করতে পারে না। অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত হয়েছে। জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের বিরোধ থাকলেও তারা কৃষকের স্বার্থে সামন্ততন্ত্রের উৎসাদন করতে পারে না বরং কিছুটা পরিমাণে সামন্ততন্ত্রকে সংকুচিত করে কৃষি অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের বিকাশকেই সাহায্য করে। কারণ তারা কৃষি বিপ্লবে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজির বিরোধ থাকলেও তারা সাধারণত নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজির স্তরে উন্নীত হতে চায়। এবং সেই বিরোধ জনসাধারণের স্বার্থের বিনিময়ে সমাধান করাই তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়ারা পরিচালক শক্তি হতে পারে না। এখানেই হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে (classical) সাধারণত বুর্জোয়ারা নেতৃত্বের ভূমিকা

পালন করেছে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের পূর্বে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়ারা আর নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকতে পারে না বা বিপ্লবের মুখ্যশক্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমগ্র জাতির বিরোধ এবং সমগ্র জাতির মধ্যে শ্রেণী বিরোধ বা সামাজিক বিরোধ—এই উভয় বিরোধ যতই প্রকট হতে থাকবে এবং পরস্পর থেকে অবিচ্ছেদ্য রূপ ধারণ করবে ততই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে দোদুল্যমানতা বেড়ে চলবে এবং তার মধ্যেও একাংশের সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে আপোষের মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।

পরাধীন ভারতে বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল মুখ্য সংগ্রাম, তখনও লেনিন বলেছিলেন—"There has been a certain rapproachment between the bourgeoisie of the exploiting countries and that of colonies, so that very often—perhaps even in most cases—the bourgeoisie of the oppressed countries, while it does support the national movement, is in full accord with the imperialist bourgeoisie, i.e, joins forces with it against all revolutionary movement and revolutionary classes."

তাই তিনি "reformist and revolutionary movements"-এর মধ্যে পার্থক্য টানতে বলেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন, "...we, as communists should and will support bourgeois liberation movements in the colonies only when they are genuinely revolutionary, and when their exponents do not hinder our work of educating and organising in a revolutionary spirit the peasantry and the masses of the exploited." (Lenin : Collected Works, vol 31)

লেনিনের শিক্ষা হল বুর্জোয়ারা যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তখন কমিউনিস্টরা বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমর্থন করবে। কিন্তু তারা যখন শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও গণতন্ত্রকে আক্রমণ করবে তখন কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। লেনিনের আরও শিক্ষা হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল উপাদান হচ্ছে কৃষক। এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দুটি ধারা আছে। একটি ধারা হচ্ছে বুর্জোয়া

জাতীয়তাবাদ এবং অপর ধারা হচ্ছে কৃষক ও মেহনতী মানুষের ধারা। দেশের বেশীর ভাগ মানুষ এই দ্বিতীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত। বিপ্লবের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই দ্বিতীয় ধারার থেকেই শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর মৈত্রীর ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছে। এই মৈত্রী হচ্ছে বিপ্লবের মূল এবং সব চেয়ে প্রবল শক্তি। এই শক্তিটা হচ্ছে আসলে বামপন্থী ঐক্যের ভিত্তি। এই শক্তিকে সংহত করতে না পারলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারাকে বিপ্লবের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। কারণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারাটা দ্বৈতচরিত্রসম্পন্ন। যতই সামাজিক বিরোধের শক্তি অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী শ্রেণী-সংগ্রামকে প্রকট করে তুলবে ততই দোদুল্যমান বুর্জোয়াদের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যান্য কায়েমী স্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা বাড়তে থাকবে। বিপ্লবের প্রধান শক্তি শ্রমিক-কৃষকের ধারার সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারাকে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের জন্ম হয়। অতএব কয়েকজন গণতন্ত্রী ও প্রগতিশীল ব্যক্তি কয়েকটা বামপন্থী পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলেই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য হয় না। কারণ এটা কয়েকজন প্রগতিশীল ব্যক্তি নির্বাচনের প্রশ্ন নয়। এটা হল মুখ্যত শ্রেণী সমাবেশের প্রশ্ন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্যুত হলে কখনও কংগ্রেস বা কখন সি. পি. এম-এর মধ্যে ঘুরপাক খেতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির বিচ্যুতি

লেনিনের এই শিক্ষাকে বাদ দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মকে বিচার করা যায় না। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করাও অসম্ভব। বিচার করা যায় না কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকৌশল এবং তার প্রয়োগকে। আরও বিচার করা যায় না কংগ্রেস শাসনকালে জরুরী অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে।

বিগত লোকসভা নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির শোচনীয় পরাজয়ের কারণ লেনিনের এই তত্ত্বকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবে ভুলের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে—"জাতীয় বুর্জোয়া এবং শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসে তার প্রতিনিধিদের প্রগতিশীল সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেখা হয়েছিল।"

প্রস্তাবে আরও স্বীকার করা হয়েছে—এমন কি ভ্রান্ত ধারণা বাসা বেঁধেছিল যে জাতীয় গণতান্ত্রিক দিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রগতিশীল পরিবর্তন সাধনে জরুরী অবস্থাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। স্বীকার করা হয়েছে—"কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মনে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পার্টির স্বাধীন ভাবমূর্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল।"

প্রশ্ন হচ্ছে জরুরী অবস্থার মধ্যে ভুলের কারণগুলি হঠাৎ আবির্ভূত হল কেন? জরুরী অবস্থা কালেই ভুলের আবির্ভাব হয়েছে এটা আদৌ সত্য নয়। ভুলগুলি সত্য বটে, কিন্তু ভুলের স্থান ও কালটা অসত্য। তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে এটাই প্রমাণিত হবে।

"...জাতীয় গণতান্ত্রিক দিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রগতিশীল পরিবর্তন সাধনে জরুরী অবস্থাকে কাজে লাগানো যেতে পারে"—এর অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়াশ্রেণী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে পারে এবং অ-ধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হতে পারে। এই ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি সাহায্য করলে কাজটা সুসম্পন্ন হবে। আসল তত্ত্বটা হল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হতে পারে। পার্টি নেতৃত্ব জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে classical ধরণের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসেবে গ্রহণ করেছেন যার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকবে বুর্জোয়া শ্রেণী। তাঁদের কাছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন পার্থক্য নেই। এই মারাত্মক তত্ত্বের অর্থ হচ্ছে বর্তমানকালের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতন্ত্রমুখীন নয়। এর পরিণাম হচ্ছে উদারনৈতিক বুর্জোয়া রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা। এর দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্বেতচরিত্রকে অস্বীকার করে বুর্জোয়াশ্রেণীকে একটা "firm" এবং "consistent" শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই লেনিনবাদবিরোধী তত্ত্ব থেকেই "জাতীয় বুর্জোয়া এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসে তার প্রতিনিধিদের প্রগতিশীল সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেখা হয়েছিল।" বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের সঙ্গে সমালোচনাহীন সহযোগিতার মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে লেনিনবাদবিরোধী তত্ত্ব এবং মোহ আত্মগোপন করেছিল। জরুরী অবস্থার মধ্যে এই তত্ত্বের জন্ম হয় নি। এর জন্ম হয়েছে অনেককাল আগে। বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এটা পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে বিচরণ করছিল মাত্র।

জরুরী অবস্থার সময় ইন্দিরা সরকার শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং

গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আক্রমণ করেছিল এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছিল। এ সত্যকে কেউ আর অস্বীকার করতে পারে না। লেনিন বলেছেন, বুর্জোয়াশ্রেণী যখন শ্রমিক-কৃষকদের আক্রমণ করবে তখন কমিউনিস্ট পার্টিকে দৃঢ়ভাবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। জরুরী অবস্থা কালে সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত বাধার মোকাবিলা করে, সম্ভাব্য সমস্ত বর্বর নিপীড়নকে অগ্রাহ্য করে জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি এবং সাহসের সঙ্গে মেহনতী মানুষের পাশে স্থান গ্রহণ করে নি। পার্টি লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং পার্টি-নেতৃত্ব দেশের, জনসাধারণের এবং পার্টি সংগঠনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছেন। মন্দের ভাল, আংশিক হলেও তাঁরা আত্মসমালোচনা করেছেন।

রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যখন "জাতীয় গণতান্ত্রিক দিকে" নিয়ে যাবে তখন কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হচ্ছে সেই বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক লক্ষ্য সাধনে সহযোগিতা করা। এই ভ্রান্ত ধারণার উৎস হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব—শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বের তত্ত্ব, যার সাংগঠনিক রূপ হচ্ছে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ঐক্য। এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে পার্টি নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়ার দ্বৈত চরিত্র সম্পর্কিত লেনিনীয় নীতির প্রতি শুধুমাত্র মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। আর ভুলের উৎস সন্ধান করা হচ্ছে কেবল জরুরী অবস্থাকালীন কার্যকলাপের মধ্যে। ভুলের স্বীকৃতি কেবলমাত্র কর্মকৌশল প্রয়োগের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং কর্মনীতি ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নি। "Magnificent leadership of Mrs. Gandhi" অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর জয়গানের উৎসও ঐ ভ্রান্ত তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়গান করে পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করা যায় না এবং তাকে রক্ষাও করা যায় না। যৌথ নেতৃত্বের তত্ত্বই হচ্ছে পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকাকে বিসর্জন দেওয়া। অথচ লেনিন বলেছেন যে সব সময় পার্টির স্বতন্ত্র সত্তাকে বজায় রাখতে হবে, বজায় রাখতে হবে তার স্বতন্ত্র ভূমিকাকে—এমন কি পার্টির "embryonic" অবস্থায়ও তা করতে হবে। যে মুহূর্তে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জাতীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তকে এবং গণতন্ত্রকে আক্রমণ করল সেই মুহূর্ত থেকে তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের সামাজিক মুক্তি সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন

করে দিল। অর্থাৎ বুর্জোয়ারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে মেহনতী মানুষের সামাজিক মুক্তি সংগ্রাম থেকে আলাদা করে দিল। শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষ কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রায় পরিত্যাগ করেছে কারণ কমিউনিস্ট পার্টি বুর্জোয়াদের কাছে তার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে ম্লান করে দিয়েছে। তৃতীয় বিকল্প শক্তি সৃষ্টি করার দায়িত্ব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিজয়ের কারণ হয়েছে।

বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যে ক্রমেই সামাজিক মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে—এই সত্যকে অস্বীকার করলে কমিউনিস্ট পার্টি তার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে পারে না। এই সত্যকে অস্বীকার করলে মেহনতী মানুষের ভূমিকা এবং শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যের ভূমিকাকে অস্বীকার করতে হয় বা লঘু করে দেখতে হয়। পার্টি নেতৃত্বকে স্বীকার করতে হয়েছে যে "শ্বাসরোধকারী ঘটনা এবং ভয়ভীতি" যে সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করছিল তাকে নেতৃত্ব লঘু করে দেখেছিলেন। ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিরোধকে লঘু করে দেখলে "শ্বাসরোধকারী ও সন্ত্রাসের" ঘটনাকেও লঘু করে দেখতে হয়।

এ সব ভুল তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য বা ফ্রন্ট গঠন সম্ভব নয়। আর এই সংগ্রামও খুব কঠিন। একদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি মোহ, আর অন্যদিকে অ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ভূমিকাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ঘটনা বার বার চক্রাকারে তার বিভেদমূলক চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে। উপরন্তু বর্তমানে দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বৃহৎ পুঁজিপতির ভূমিকা আরও অধ্যয়ন ও অনুশীলন করার প্রয়োজন। বিচিত্র ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে যারা জাতীয় বুর্জোয়া সম্পর্কে মোহগ্রস্ত তাদের অনেকেই আবার রাতারাতি শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে 'সজাগ' হয়ে পাতিবুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বুর্জোয়ারা হল মিত্র, আর পাতি-বুর্জোয়ারা হল শত্রু। অথচ বহু কাঠামোবিশিষ্ট অর্থনীতিতে পাতিবুর্জোয়ার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা ভুলে যান যে এ পাতিবুর্জোয়ার থেকে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের জন্ম হয়। এদের বাম অংশ সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দি অতিক্রম করে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি আসে, সমাজ-তান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হয় ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে। কংগ্রেসের মধ্যে যে সব প্রগতিশীলেরা রয়েছে তারা এখনও বিপ্লবী গণতন্ত্রের

স্তরে পৌঁছতে পারে নি। তাদের মধ্যে বিপ্লবী গণতন্ত্রের উপাদান থাকলেও তারা এখন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী। বিপ্লবী গণতন্ত্রের ভ্রূণ অবস্থার বিকাশ হতে পারে যদি কমিউনিস্ট পার্টি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি মোহ পরিত্যাগ করে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ত শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, ছাত্র যুবকেরা এখনও নিজেদের গণসংগঠনে ঐক্যবদ্ধ নয়। দলমত নির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গঠন করা কঠিন কাজ হলেও এ কাজ সম্পাদন না করলে শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য গঠন করা অসম্ভব। এই ঐক্য গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যেই পার্টির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং স্বাধীন ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই মূল ভিত্তিকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন পার্টি ও গণতন্ত্রীর মধ্যে ঐক্য হলেই তাকে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য বলা যায় না। এই ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী কৃষকসমাজের মৈত্রী, যে মৈত্রী হচ্ছে মুখ্যশক্তি, পরিচালকশক্তি, যার ওপর নির্ভর অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশ। বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভিত্তি করে বা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে সম্বল করে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য হয় না। আলেয়াকে মুখ্যশক্তি মনে করে মুখ্যশক্তিকে গৌণ শক্তি মনে করলে বারবার বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার শক্তি কারও থাকবে না, থাকতে পারেও না।

অতএব যে সব শ্রেণী বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের মুখ্যশক্তি সেই সব শ্রেণী-শক্তিকে সংগঠিত করা এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার দিকে নজর দিতে হবে। রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ যখন সচেতন হয়ে উঠেছে তখন কংগ্রেস ও জনতা পার্টির বিরুদ্ধে তৃতীয় বিকল্প শক্তিকে গড়ে তোলার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই শক্তি হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য। বামশক্তির বা পার্টির মধ্যে অনেক অসঙ্গতি থাকলেও তারা অচ্ছ্যুৎ হয় নি, আর গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব থাকলেও তারা পরিত্যাজ্য নয়। অসঙ্গতি ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অতি বামশক্তির বৈশিষ্ট্য, তেমনই মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের স্বাভাবিক ধর্ম। সংগ্রামের মধ্যে উভয়েরই পরিশোধন হয়। আর সেই সংগ্রামের মুখ্যশক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সমাজের ঐক্য। বর্তমান যুগে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্য সমাজতন্ত্রমুখীন বলে এই ঐক্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই ঐক্যই বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মূল ভিত্তি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের খসড়া সংবিধান সম্পর্কে লিওনিদ ব্রেঝনেভ'এর রিপোর্ট

প্রথম কথা : নতুন সংবিধান রচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কেন ?

কমরেডগণ, প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এই কারণে যে গত চার দশকের মধ্যে আমাদের দেশে ও আমাদের সমগ্র সমাজে গভীর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

১৯৩৬ সালের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন আমরা সবেমাত্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সৃষ্টির কাজটি সম্পূর্ণ করেছি। যৌথ খামারের ব্যবস্থা তখনো ছিল একেবারেই নবীন এবং তার সংহতিসাধনের প্রয়োজন ছিল। জাতীয় অর্থব্যবস্থার প্রাযুক্তিক মান তখনও পর্যন্ত ছিল সবচেয়ে অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশগুলির চেয়ে অনেক নীচে। জীবনের নানা দিকে তখনও পর্যন্ত প্রাক-বিপ্লব সময়কালের দায় প্রকাশ পাচ্ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন আমাদের রয়েছে অগ্রসর পূর্ণ-বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ। **জনজীবনের প্রতিটি দিকে সংঘটিত হয়েছে মৌল গুরুত্বসম্পন্ন প্রধান প্রধান পরিবর্তন।**

দেশের অর্থব্যবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। এতে সর্বময় হয়ে বিরাজ করছে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা। রয়েছে সমন্বিত ও শক্তিশালী জাতীয় অর্থনৈতিক অবয়ব যা সাফল্যের সঙ্গে ক্রিয়াশীল। এই অর্থব্যবস্থাকে বিকশিত করে তোলা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লবকে একীভূত করার মাধ্যমে।

দেশের সামাজিক গড়নও বদলে গিয়েছে।

বর্তমানে আমাদের শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছে দেশের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ। এই শ্রমিকশ্রেণী গঠিত কোটি কোটি শিক্ষিত, কারিগরী দিক থেকে দক্ষ ও রাজনৈতিক দিক থেকে পরিণত মানুষ নিয়ে। তাদের কাজ ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় হয়ে উঠছে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী কর্মীদের অনুরূপ।

শ্রমিকদের সামাজিক তৎপরতা এবং রাষ্ট্র-চালনার ব্যাপারে তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষকরাও বদলে গিয়েছে। আজকের দিনের যৌথখামারের কৃষকের জন্ম ও বড় হওয়া যৌথখামারেই এবং তার মানসিকতার রূপায়ণ সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিভূমিতে। তার হাতে এসেছে আধুনিক কারিগরী সুযোগসুবিধা এবং তার শিক্ষাগত পটভূমি ও জীবনযাত্রার ধরন প্রায়শই এমন যার সঙ্গে শহরের অধিবাসীর জীবনের তফাৎ সামান্যই।

বুদ্ধিজীবীরা ও পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রকৃতই হয়ে উঠেছে জনগণের প্রতিনিধি ও সমাজতান্ত্রিক চরিত্রবিশিষ্ট। জনগণের সাংস্কৃতিক মান যত উন্নত হয়ে ওঠে, কমিউনিজম নির্মাণে বিজ্ঞান যত অভূতপূর্ব গুরুত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে, ততই আমাদের সমাজজীবনে বুদ্ধিজীবীদের ও পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট গুরুত্ব বেড়ে চলে।

জাতিসমূহের সমতা এক বাস্তব ঘটনা হয়ে উঠেছে—শুধু আইনের দিক থেকে নয়, বাস্তবতার দিক থেকেও। আমাদের সকল প্রজাতন্ত্র,—এমনকি সেই সমস্ত প্রজাতন্ত্রও যারা ছিল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া —এখন উন্নতির উচ্চ মাত্রা অর্জন করেছে। একই সঙ্গে পৃথক পৃথক প্রজাতন্ত্রের আর্থব্যবস্থা হয়ে উঠেছে সমন্বিত জাতীয় আর্থব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এই সমস্ত পরিবর্তনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল সোভিয়েত সমাজের ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমরূপতা। শ্রমিকশ্রেণী, যৌথখামারের কৃষক এবং জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপ বুদ্ধিজীবী ও পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের অটুট মৈত্রী আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মূল সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার পার্থক্য ক্রমেই দূরীভূত হচ্ছে। জীবনের গতিই আরো পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসছে এ-দেশের সকল জাতি ও জাতীয় গোষ্ঠীকে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক নতুন ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠী—সোভিয়েত জনগোষ্ঠী।

পূর্ণ-বিকশিত সমাজতন্ত্র অর্জন এবং জনগণের সকল অংশ কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর ভাবাদর্শগত ও রাজনীতিগত অবস্থান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব রূপে তা হয়ে উঠেছে গোটা জনগণের রাষ্ট্র।

দেশের জীবনে এই সমস্ত প্রক্রিয়াকে চালনা করেছে এবং এখনও করছে কমিউনিস্ট পার্টি, যে কমিউনিস্ট পার্টি অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকেই হয়ে

থেকেছে দেশের নেতৃস্থানীয়, সংগঠনকারী, সমাবেশকারী শক্তি। কমিউনিস্ট পার্টিকে যে-সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে তা এখন হয়ে উঠেছে আরও বিভিন্ন ও জটিল। কমিউনিস্ট পার্টিকে এখন ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে আরও অধিক দায়িত্ব গ্রহণের এবং দেশের সমগ্র আভ্যন্তরিক জীবনে ও পররাষ্ট্র নীতিতে আরও অধিক প্রভাব বিস্তারের।

পরিশেষে, সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাভূমি এবং বিশ্বের সমগ্র সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্রও আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পুঁজিবাদী বেষ্টনীর অবসান ঘটেছে। সমাজতন্ত্র হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যবস্থা। শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক পরিবারের উদ্ভব হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের অবস্থান দারুন রকমের দুর্বল হয়ে গিয়েছে। পূর্বতন উপনিবেশ-গুলির স্থানে দেখা দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বহুসংখ্যক নবীন রাষ্ট্র। আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রভাব অপরিমেয় রকমের বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলে, বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন একটি বিশ্বযুদ্ধ নিবারণ করার প্রকৃত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমনি একটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার বিপদ ইতিমধ্যেই প্রভূত হ্রাস পেয়েছে যদিও এক্ষেত্রে এখন অনেক কাজ ও কঠিন লড়াই বাকি।

পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েত জনগণ যা কিছু অর্জন করেছেন তারই ওপরে নির্ভর করে তাঁরা এখন নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করছেন: যথা, কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি সৃষ্টি, সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ককে ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্ট সম্পর্কে রূপান্তরণ এবং কমিউনিস্ট সচেতনতার মনোভাব থেকে জনগণকে শিক্ষাদান।

১৯৩৬ সালের পর থেকে এই হচ্ছে আমাদের সমাজের ও আমাদের দেশের জীবনে প্রধান প্রধান পরিবর্তন। সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধান রচনা করার পিছনে এই হচ্ছে মূল কারণ ও ভিত্তি।

নতুন সংবিধানের খসড়া হচ্ছে দীর্ঘ ও তাত্ত্বিক প্রস্তাবের ফল। তার ভিত্তি হচ্ছে পার্টির স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, "নতুন সংবিধানের খসড়ায় স্পষ্টতই প্রতিফলিত হওয়া উচিত সমাজতন্ত্রের বিরাট জয়সমূহ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত সমাজতান্ত্রিক

ব্যবস্থার সাধারণ নীতিগুলি যাতে প্রকাশ পাবে আমাদের রাষ্ট্রের শ্রেণীমর্ম শুধু তাই নয়, পরন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও তার রাজনৈতিক সংগঠনের মূল লক্ষণও।" রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিচালনার, ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকার ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অধিকতর বিকাশসাধনের নীতিগুলি প্রতিফলিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা।

পার্টির দ্বারা বিবৃত এই সমস্ত নির্দেশক কর্মধারা বর্তমান খসড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে।

খসড়া নিয়ে কাজ করার সময়ে আমরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ভিত্তিভূমির ওপরে। ভি. আই. লেনিন তাঁর সময়ে সমাজতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হিসেবে যে রূপরেখা উপস্থিত করেছিলেন তা খসড়ায় বজায় রাখা হয়েছে ও বিকশিত করা হয়েছে।

ভি. আই. লেনিন ও বলশেভিক পার্টি এই ধারণা থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন যে সংবিধান কেবলমাত্র একটি আইন সম্বন্ধীয় কর্ম নয়, একটি প্রধান রাজনৈতিক দলিলও। পার্টির মতে সংবিধান হচ্ছে বিপ্লবের অর্জনগুলির অনুমোদন এবং তৎসহ সমাজতন্ত্র নির্মাণের মৌল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ঘোষণা।

এই ছিল ১৯১৮ সালের রুশ ফেডারেশনের প্রথম সংবিধান। তাতে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের অর্জনগুলি এবং সূত্রবদ্ধ করা হয়েছিল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত রাষ্ট্রের শ্রেণীমর্ম।

এই ছিল ১৯২৪ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানও। তাতে লিপিবদ্ধ ছিল এক ফেডারেল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের নীতিগুলি।

১৯৩৬ সালের সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের জয়লাভের বিষয়টি এবং সেখানে সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করা হয়েছিল ক্ষমতা ও প্রশাসনিক সংস্থার সমগ্র ব্যবস্থা ও তৎসহ নির্বাচন-সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলীর। সামাজিক অগ্রগতির যে সংবিধানগত কাঠামো সে সময়ে খাড়া করা হয়েছিল তা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

বর্তমানে বলবৎ সংবিধানের বহু মৌল সংস্থান বর্তমান খসড়ায় বজায় রাখা হয়েছে, কেননা এই ধারাগুলি আমাদের ব্যবস্থার সারবস্তুর সঙ্গে ও আমাদের উন্নয়নের বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ফলত, নতুন সংবিধানের খসড়ায় একদিকে সোভিয়েত ইতিহাসের সমগ্র

সংবিধানগত অভিজ্ঞতাকে সমষ্টিগত রূপ দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই অভিজ্ঞতাকে আধুনিক কালের প্রয়োজনের উপযোগী নতুন আধেয় দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

উপরন্তু, খসড়া নির্ভর করছে ইতিমধ্যে অর্জিত সোভিয়েত বিধানের সবায়ণ ও উন্নয়নের উপরে এবং, বলা চলে, ধারণ করেছে এক্ষেত্রে কৃত সবকিছুর সর্বোচ্চ রূপটি।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনেক কিছু করা হয়েছে। জাতীয় বিধানের এবং আইনের অধিকাংশ প্রধান শাখা সম্পর্কিত প্রজাতান্ত্রিক সংহিতাগুলির মৌল বিষয়গুলি কার্যকর হয়েছে। এখন আমাদের আছে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদনগত সংস্থা বিষয়ক বিধি, যৌথখামার বিষয়ক নতুন নিয়মাবলী। স্বাস্থ্যব্যবস্থা, জনশিক্ষা, অবসর-ভাতা পরিকল্পনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ামক নতুন আইন গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় সোভিয়েতগুলির অধিকার ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ডেপুটিদের অবস্থান ও মর্যাদা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই সমস্ত আইন খসড়া সংবিধানে বিধৃত আছে এবং তা হয়ে উঠেছে, বলা চলে, নতুন সংবিধানের বহু ধারার নির্মাণকারী উপকরণ।

প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি বিষয় আছে। খসড়া সংবিধানে **বিবেচিত হয়েছে ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংবিধান রচনা করার অভিজ্ঞতা**। সত্তরের দশকে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়েছে বুলগেরিয়ায়, জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে, কিউবায় ও অন্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে। এই সমস্ত সংবিধানে এমন কিছু ধারা আছে যা আমাদের কাছে আগ্রহের বিষয় এবং সেগুলিকে আমরা উপেক্ষা করি নি।

অতএব, কমরেডগণ, নতুন সংবিধান দাঁড়িয়ে আছে সুদৃঢ় বাস্তব ও তত্ত্বগত ভিত্তির উপরে। পলিটব্যুরোর বিশ্বাস, এই হচ্ছে সংবিধানের স্থিরতার এবং সোভিয়েত সমাজের অধিকতর অগ্রগতিকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবান্বিত করার নিশ্চয়তা।

এবারে আমি **খসড়া সংবিধানের বিষয়বস্তুর প্রধান লক্ষণগুলি** বিবৃত করতে চাই।

প্রথমত, এই ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খসড়া সংবিধান উপস্থিত করছে **কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ও পরিচালনাকারী ভূমিকার বিস্তৃত লক্ষণ বর্ণনা** এবং স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করছে সোভিয়েত সমাজে ও রাষ্ট্রে তার সঠিক

স্থান। ১৯৩৬ সালের সংবিধানের মত নয়, নতুন সংবিধানের খসড়ায় বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে অধিকতর বিস্তৃতভাবে এবং পৃথক একটি ধারায়।

খসড়া সংবিধানে আরও বলা হয়েছে, **সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত হয়েছে এক অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের চরম লক্ষ্য হচ্ছে কমিউনিজম নির্মাণ।** খসড়া সংবিধানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, **আমাদের রাষ্ট্র সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র** এবং এই রাষ্ট্রে প্রকাশ পাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের এবং দেশের সকল জাতি ও অধিজাতির ইচ্ছা ও স্বার্থ। অতএব প্রস্তাব করা হয়েছে, আমাদের সোভিয়েতগুলির নতুন নাম হোক **জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েত।**

খসড়া সংবিধানে এই নীতির সংস্থান বজায় আছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদনের উপায়গুলির সমাজতান্ত্রিক মালিকানা। একই সঙ্গে নতুন সংবিধানে জীবনের প্রয়োজনে উপলব্ধ কিছু সংশোধনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং যৌথখামার ও সমবায় সমিতির সম্পত্তির পাশাপাশি খসড়া সংবিধানে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণ-সংগঠনের সম্পত্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলা চলে, **খসড়া সংবিধানে উদ্ভাবনসমূহের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিস্তৃতিসাধন ও গভীরতা সাধন।** সর্বোপরি আরও উন্নত করে তোলা হয়েছে সোভিয়েতসমূহের গড়ন ও তৎপরতার গণতান্ত্রিক নীতিগুলি। সমাজের জীবনের প্রধান প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তিসাধনে তাদের ভূমিকা বাড়ানো হয়েছে।

১০৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধিগত এলাকায় সমস্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি করার কর্তৃত্ব রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের। স্থানীয় সোভিয়েতগুলি শুধু যে স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে তাই নয়, তাদের কর্তৃত্বের সীমানার মধ্যে এলাকাস্থিত অন্যান্য সংগঠনের তৎপরতাকেও নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত করে। খসড়া সংবিধানে বিশেষ উপর দেওয়া হয়েছে সোভিয়েতসমূহ কর্তৃক কার্যনির্বাহী ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলির এবং সংগঠন ও কর্মীদের তৎপরতার সুসম্বদ্ধ নিয়ন্ত্রণের উপরে।

সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কার্যকাল বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে এবং স্থানীয় সোভিয়েতের আড়াই বছর। একই সময়কালের জন্য আদালত নির্বাচিত হবে।

জনগণের সঙ্গে সোভিয়েত ও তাদের ডেপুটিদের সম্পর্ক-বন্ধন জোরদার করার

প্রধান প্রধান পদগুলি খসড়া সংবিধানে নিরূপণ করা হয়েছে। সোভিয়েত ও ডেপুটিদের অবশ্যই তাদের তৎপরতা সম্পর্কে জনগণকে নিয়মিত অবহিত করতে হবে, নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং শ্রমজীবী জনগণের প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

কমরেডগণ, আপনারা জানেন পাঁচ বছর আগে সোভিয়েতের ডেপুটিদের পদমর্যাদা সম্পর্কে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন গ্রহণ করেছি। ডেপুটিদের ভূমিকাকে আরও বাড়াবার জন্য সেই আইনের অন্তর্ভুক্ত মৌল ক্ষমতাগুলি আমরা এখন খসড়া সংবিধানের পাঠে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

নির্বাচন-ব্যবস্থায় একটি উদ্ভাবন আনা হয়েছে। বর্তমান সংবিধানে বলা হয়েছে, যে-কোনো নাগরিক তেইশ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে নির্বাচিত হতে পারেন, একুশ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে নির্বাচিত হতে পারেন। এখন প্রস্তাব করা হয়েছে, আঠারো বছর বয়স হলেই এই সুবিধা ভোগ করা যাবে। এই হচ্ছে তরুণদের নিয়ে আমাদের সমাজের ভাবনা ও তাদের ওপরে আস্থার জাজ্বল্যমান প্রকাশ।

খসড়া সংবিধানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে দেশের জীবনে ট্রেড ইউনিয়ন, কমসোমল, সমবায় সমিতি ও অন্যান্য গণ-সংগঠনের ভূমিকা। এই সংগঠনগুলিকে নিশ্চিতভাবে দিতে হবে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধানে অংশগ্রহণের অধিকার এবং আইন প্রণয়নে প্রবৃত্ত হবার অধিকার। এ থেকে পুনরায় দেখা যাচ্ছে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র সকল সামাজিক অংশ ও গোষ্ঠীর স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন।

খসড়া সংবিধানে কাজের সমষ্টি-সংস্থাগুলির ভূমিকা সম্পর্কিত একটি ধারাও আছে। এ থেকে বোঝা যায় পার্টি'র নীতিগত অবস্থান এবং উৎপাদন পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতির বিকাশসাধনে পার্টির আরোপিত গুরুত্ব।

অগ্রসর সমাজতন্ত্রের নির্মাণ আমাদের সমর্থ করে **সোভিয়েত নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত** মৌল আইনের সংস্থানগুলির প্রভূত উন্নতিসাধনে। ''কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহারের'' সেই বিখ্যাত উক্তি—''সকলের অবাধ উন্নয়নের শর্ত হচ্ছে প্রত্যেকের অবাধ উন্নয়ন''—হয়ে উঠেছে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের রাষ্ট্রের অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতি। খসড়ায় তার প্রতিফলন ঘটেছে।

সোভিয়েত নাগরিকদের সমানাধিকারের সাধারণ নীতি একটি বিশেষ

অংশে ঘোষিত হয়েছে। উপরন্তু, খসড়ায় সর্বাধিক স্বচ্ছতার সঙ্গে সূত্রায়িত হয়েছে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমানাধিকারের এবং জাতি নৃকুল পর্যায় নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের নিশ্চয়তাসাধনের ক্ষেত্রগুলিতে সমাজতন্ত্রের কৃতিত্বসমূহ।

বর্তমান সংবিধানে জনগণের জীবনের একেবারে প্রধান বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের বিরাট সমাহারেরও সংস্থান রয়েছে। কিন্তু আমরা সকলে ভালভাবেই জানি যে এই সমস্ত অধিকারের অর্থ হয়ে উঠেছে আরও অনেক গভীর এবং তার বাস্তব নিশ্চয়তাসাধন আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকর। খসড়া সংবিধানে এই সমস্ত কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে। আগে যেখানে নিশ্চিতভাবে বলা হত কর্মলাভের অধিকারের কথা, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নিজ নিজ ঝোঁক প্রতিভা ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ অনুযায়ী এবং উপরন্তু—যেটি কোনোক্রমেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—সমাজের প্রয়োজনের দিকে যথাযথ অভিনিবেশ অনুযায়ী জীবিকা ও কর্ম নির্বাচনের অধিকার।

সেখানে ১৯৩৬ সালের সংবিধানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে পীড়া বা অক্ষমতার সময়ে ভরণপোষণ লাভের অধিকার, এখন সেখানে প্রশ্নটি বিবেচিত হচ্ছে ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে। সোভিয়েত জনগণকে নিশ্চিতি দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকারের। যেখানে শিক্ষালাভের অধিকারকে বিবৃত করা হয়েছিল সাধারণ ভাষায়, এখন সেখানে খসড়ায় বলা হয়েছে আবশ্যিক সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কথা এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের কথা।

খসড়ায় আরও আছে সোভিয়েত নাগরিকদের এমন এক অধিকারের কথা বর্তমান সংবিধানে যা অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি বলতে চাইছি বাসগৃহ লাভের অধিকারের কথা। এই অধিকার ক্রমেই আরও বেশি বেশি নিশ্চয়তালাভ করছে গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা রূপায়িত হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং সমবায়ী ও ব্যক্তিগত মালিকানার গৃহনির্মাণে সরকারী সহায়তাদানের মাধ্যমে। আমাদের নতুন সংবিধান হবে বিশ্বের প্রথম সংবিধান যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে মানুষের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই অধিকার।

খসড়ায় আরও অনেক বেশি সর্বাঙ্গীণভাবে বিবৃত করা হয়েছে সোভিয়েত নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা।

ঘোষণা করা হয়েছে রাষ্ট্রের ও সর্বসাধারণের বিষয়ের প্রশাসনে প্রত্যেক

সোভিয়েত নাগরিকের যোগদানের অধিকার এবং বলা হয়েছে এরূপ অংশ-গ্রহণের নির্দিষ্ট রূপগুলির কথা। বর্তমান সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে যে বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, জনসভার স্বাধীনতা, রাস্তায় মিছিল করার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তা পূর্ণমাত্রায় পুনরায় বিবৃত করা হয়েছে। ব্যক্তির অধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে যুক্ত হবে নাগরিকদের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কাছে প্রস্তাব পেশ করার, কাজে ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করার, কর্মচারী-দের কাজ সম্পর্কে আদালতে আবেদন করতে পারার অধিকার এবং জীবন ও স্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্মান ও মর্যাদা বিপন্ন হতে পরে এমন সমস্ত কিছুর প্রতিকারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারার স্বাধীনতা।

কমরেডগণ, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে খসড়া সংবিধান এই ধারণা থেকে অগ্রসর হয়েছে যে নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত জনগণের স্বার্থহানিকর রূপে ব্যবহার করা চলবে না এবং কিছুতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, খসড়ায় সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রয়োগ কদাচ এমন হবে না যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অন্যান্য নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। বলা হয়েছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা মঞ্জুর করা হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংহতিসাধনের উদ্দেশ্যে।

প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিককে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে সবকিছু বলা ও করার পরেও একথাটি থেকে যায় যে ব্যক্তির অধিকারের প্রধান নিশ্চয়তা হচ্ছে স্বদেশের শক্তি ও সমৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নাগরিককে সমাজের কাছে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং সুবিবেকীভাবে রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে।

অতএব, খসড়া সংবিধানে জোর দেওয়া হয়েছে সততার সঙ্গে ও সুবিবেকী-ভাবে কাজ করার এবং স্বদেশকে রক্ষা করার জন্য নাগরিকদের কর্তব্যের উপরে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার, তার পরাক্রম ও মর্যাদা বাড়ানোর, জনজীবনের শৃংখলা রক্ষার কাজে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার, সরকারি ও সর্বসাধারণের সম্পত্তি অপহরণ ও অপচয় রোধ করার, প্রকৃতিকে রক্ষা ও তার

সম্পদকে সুরক্ষিত করার এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য আগ্রহ দেখানোর কর্তব্যকে এই প্রথম সাংবিধানিক দায় হিসেবে সূত্রায়িত করা হয়েছে। খসড়া সংবিধান শিশুদের শিক্ষার জন্য তাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যত্নবান হতে নাগরিকদের দায়বদ্ধ করেছে।

"সামাজিক বিকাশ ও সংস্কৃতি" শীর্ষক খসড়ার একটি বিশেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিকাশের জন্য, নাগরিকদের কাজের অবস্থা উন্নত করার জন্য, তাঁদের আয় বাড়ানোর জন্য এবং জনসম্ভোগ তহবিলের বৃদ্ধি ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের জন্য রাষ্ট্র যত্নবান। এখানে বলা হয়েছে যে কমিউনিজম অভিমুখে আমাদের যাত্রাপথে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার, মস্তিষ্কের কাজ ও কায়িক শ্রমের মধ্যেকার মূল প্রভেদ দূর করার মত লক্ষ্য অর্জনের কাজ রাষ্ট্র সহজতর করে এবং সমাজের সামাজিক সমরূপতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সমাজতান্ত্রিক আইনানুগত্য ও আইনসংহতি আরও শক্তিশালী করার বিষয়টিও নতুন সংবিধানের খসড়ায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

কমরেডগণ, আমরা জানি যে বর্তমানে চালু সংবিধানটি গৃহীত হওয়ার পরের কয়েক বছর অবৈধ নিপীড়ন এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতি, পার্টি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের লেনিনবাদী রীতিনীতি লঙ্ঘনের ঘটনায় তমসাবৃত ছিল। সংবিধানের ধারা লঙ্ঘন করে তা করা হয়েছিল। পার্টি এরূপ কাজের কঠোর নিন্দা করেছে এবং আর কখনও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া চলবে না।

সোভিয়েত আইনকানুন উন্নত করার ক্ষেত্রে এবং নাগরিকদের কোনরূপ অধিকার খর্ব করা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও আমলাতান্ত্রিক বিকৃতির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় নিশ্চিতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত ও সোভিয়েত সরকার কি বিরাট কাজ করেছে তা প্রত্যেকেই জানেন। এইসব নিশ্চিতিরই যেন সামান্তীকরণ করে খসড়ায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে সংবিধান ও আইন মেনে চলা রাষ্ট্রের সকল সংস্থা ও পদস্থ কর্মকর্তাদের, গণসংগঠন ও নাগরিকদের কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

কমরেডগণ, **সোভিয়েত ইউনিয়ন এক বহুজাতিক রাষ্ট্র।** অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ফেডারেল কাঠামোর মূল উপাদানগুলি প্রত্যাশা পূরণ করেছে পরিপূর্ণরূপে। সুতরাং আমাদের সোভিয়েত সমাজ-

তান্ত্রিক ফেডারেশনের রূপগুলির ক্ষেত্রে নীতির কোনরূপ পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।

১৯৩৬ সালের সংবিধানের মতই খসড়ায় বলা হয়েছে যে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির সার্বভৌম অধিকার ইউনিয়নই রক্ষা করবে। এইসব অধিকারের নিশ্চিতি বলবৎ থাকছে। অধিকন্তু, তা পরিপুষ্ট হবে আরও কতকগুলি অধিকার দিয়ে, যেমন—ইউনিয়নের সংস্থাগুলির দ্বারা ইউনিয়নের ক্ষমতার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে নিষ্পত্তির কাজে প্রজাতন্ত্রগুলির অংশগ্রহণের অধিকার। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলিকে তাদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের মারফৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে আইন উপস্থাপনার অধিকার দেওয়া হবে।

সেই সঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতি ও জাতীয় গোষ্ঠীর উত্তরোত্তর কাছাকাছি চলে আসার ফলে রাষ্ট্রের ফেডারেল নীতিকে সংহত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অখণ্ড ফেডারেল বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংজ্ঞাতেই (৬৯ ধারা) তা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সাধারণ ফেডারেল নীতিগুলির সংহতি খসড়ার অন্য কয়েকটি ধারাতেও প্রতিফলিত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে জাতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর প্রশ্ন বিবেচনার ব্যাপারে খসড়ায় বহুজাতিক ইউনিয়নের অভিন্ন স্বার্থ ও তার প্রতিটি অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের স্বার্থের প্রকৃত গণতান্ত্রিক মিলন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এদেশের সকল জাতি ও জাতীয় গোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও ক্রমাগত কাছাকাছি আসাকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

খসড়ায় আমাদের জাতীয় অর্থব্যবস্থার বিকাশের নতুন স্তর প্রতিফলিত হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থব্যবস্থা তার সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে সামাজিক উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সকল ক্ষেত্রকে বেষ্টন করে এক অখণ্ড জাতীয় অর্থনৈতিক সমাহারে পরিণত হয়েছে।

অনুরূপভাবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সমিতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও উদ্যোগের সঙ্গে পরিকল্পিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মিলনের মত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত নীতিও এতে বিধিবদ্ধ হয়েছে।

খসড়া সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাষ্ট্রসংস্থা, মন্ত্রিদপ্তর ও বিভাগগুলির ক্ষমতা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমানে বলবৎ সংবিধানের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, খসড়ায় ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন-প্রজাতান্ত্রিক মন্ত্রিদপ্তর ও বিভাগ-

গুলির তালিকা দেওয়া হয় নি। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই তালিকা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়; সেকথা বিবেচনা করে খসড়া সংবিধানের ১৩৩নং ধারা অনুসারে গৃহীতব্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ সংক্রান্ত এক বিশেষ আইনে তা প্রকাশ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়েছে।

কমরেডগণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাভূমির মৌলিক পরিবর্তন, বিশ্ব রাজনীতিতে তার বিপুল প্রভাব বৃদ্ধি, এবং আমাদের বিকাশের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উপাদানগুলির ঘনিষ্ঠ পরস্পর সম্পর্কের দরুন **সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে এক বিশেষ অধ্যায়** খসড়া সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সংবিধানে এরকম একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এই প্রথম।

এতে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত রাষ্ট্র সুসঙ্গতভাবে শান্তির লেনিনবাদী নীতি অনুসরণ করে এবং জাতিসমূহের অধিকতর নিরাপত্তা ও ব্যাপক আকারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সপক্ষে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম নির্মাণের অনুকূল আন্তর্জাতিক অবস্থা সৃষ্টি করা, বিশ্ব সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানভূমিকে সুদৃঢ় করা, জাতীয় মুক্তি ও সমাজ প্রগতির জন্য জাতিসমূহের সংগ্রামকে সমর্থন করা, আগ্রাসী যুদ্ধ রোধ করা এবং বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি সুসঙ্গতভাবে রূপায়িত করা। এই সর্বপ্রথম একটি সংবিধানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হবে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অঙ্গাঙ্গী অংশ। সমাজতন্ত্রের দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী, সহযোগিতা ও কমরেডসুলভ পারস্পরিক সহায়তাকে সে বিকশিত ও শক্তিশালী করে তুলছে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে।

সমাজতান্ত্রিক স্বদেশভূমির প্রতিরক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ অধ্যায়ও এই প্রথমবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর বিশেষ অধিকারবলে এক জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন ও তার গঠনবিন্যাস অনুমোদন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সংক্ষেপে, এগুলি হল সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানের খসড়ায় বৈশিষ্ট্যসূচক প্রধান প্রধান বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গে বামজোটের সরকার সম্পর্কে

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে (১৯৭৭) বামজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে বামজোট ২৩০টি আসন দখল করেছে। এর মধ্যে বামজোটের প্রধান সি-পি-এম একাই ১৭৮টি আসন পেয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছে ২৫টি আসন, আর-এস-পি ২০টি, আর-সি-সি আই ৩টি, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট) ৩টি এবং বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস ১টি। অপরদিকে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ২০টি আসন। আর জনতা পার্টি পেয়েছে ১১টি আসন। ফলে, এই কথা ধরে নেওয়া যায় যে আগামী পাঁচ বছরের মত পশ্চিমবঙ্গ শাসন করার অধিকার জনগণ বামজোটের সরকারকে দিয়েছে।

আমরা মনে করি ,পশ্চিমবঙ্গে বামজোটের সরকার গঠন এক অতি তাৎপর্য-পূর্ণ ঘটনা। লক্ষ্য করার বিষয়, ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে (যেমন : বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা প্রভৃতি) যা ঘটেছে, আর পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটেছে, সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনতা পার্টির সরকার। অর্থাৎ বুর্জোয়াদের একটি অংশের বদলে বুর্জোয়াদের অপর আর একটি অংশ ক্ষমতা দখল করেছে। সুতরাং শ্রেণীদৃষ্টি থেকে দেখলে বিভিন্ন রাষ্ট্রে শোষকশ্রেণীর এক অংশের বদলে আর এক অংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটেছে—তা সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে বুর্জোয়াশ্রেণীর এক অংশের পরিবর্তে বুর্জোয়াশ্রেণীর আর এক অংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় নি। এখানে ক্ষমতায় এসেছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী দল—যারা বুর্জোয়াশ্রেণীর কোনো অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে না, যারা শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত, এক কথায়, অ-শোষক শ্রেণীগুলির পক্ষ অবলম্বন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এইটিই পশ্চিমবঙ্গে বামজোটের সরকার গঠনের প্রধান তাৎপর্য।

আমরা জানি, একটি বুর্জোয়া গঠনতন্ত্রের সীমারেখার মধ্যে নবনির্বাচিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কাজ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন ধনতন্ত্রের পথ অনুসরণ করছে, তখন একটি রাষ্ট্র সরকারের পক্ষে, ধনতন্ত্রের পথের সরাসরি বিরোধিতা করে, মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। তাই বলে বুর্জোয়া গঠনতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এই সরকার নিষ্ক্রিয় থাকলে জনগণ ক্ষমা করবে না। বিশেষ করে, দেখা গেছে যে কেরালার অচ্যুত মেনন সরকার বুর্জোয়া গঠনতন্ত্রের সীমারেখার মধ্যেই থেকে কৃষকের স্বার্থে বেশ কিছুটা ভূমি সংস্কার প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল। কাজেই জনগণের স্বার্থে যতটা কাজ করতে পারা যায় ততটুকুই এই সরকার করবে এই আশা জনগণ পোষণ করে। জনগণ দেখতে চাইবে—মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই সরকার শ্রমিকের পক্ষ অবলম্বন করবে। জোতদার ও কৃষকের সংগ্রামে কৃষকের হয়ে লড়বে। নিম্ন মধ্যবিত্তের অধিকারগুলি রক্ষা করবে। বুর্জোয়া গঠনতন্ত্রের সীমারেখার মধ্যে থেকেও এই সরকার এমনভাবে কাজ করবে যাতে অ-শোষক শ্রেণীগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সমস্যা-জর্জরিত রাষ্ট্র। এই সমস্যা মূলত দারিদ্র্যের সমস্যা। এই দারিদ্র্যের মূল কারণ—এই রাষ্ট্রের অর্থনীতি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারা কবলিত। এদের সঙ্গে রয়েছে গ্রামের রক্তচোষা জোতদার ও অন্যান্য শোষক সম্প্রদায়।

এই একচেটিয়া পুঁজিপতি ও জোতদারেরা আপ্রাণ চেষ্টা করবে—যাতে বামজোটের সরকার পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। কেননা, শ্রেণীস্বার্থী দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা সমাধানের অর্থই হল : জনকল্যাণমূলক এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও জোতদারদের অবাধ শোষণ সংকুচিত হতে পারে। এই একচেটিয়া পুঁজিপতি ও জোতদারদের প্রতিনিধিরা রয়েছে কংগ্রেস এবং জনতা উভয় পার্টির মধ্যেই। কাজেই শুধু কংগ্রেস নয় জনতা পার্টিও (যার মধ্যে রয়েছে একান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিনিধি স্থানীয় জনসংঘ ও সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা) বামজোটের সরকারের কাজে বাধা দেবে—এই পরিস্থিতির জন্যে বামজোটের সরকারের মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

শুধুমাত্র কংগ্রেসকে শত্রু হিসাবে দেখলে ভুল হবে। জনতা পার্টির কলাকৌশল সম্পর্কে প্রথম থেকেই অবহিত থাকা প্রয়োজন। জনতা পার্টি বামজোটের সরকার সম্পর্কে দুটি কৌশল অবলম্বন করতে পারে। একদিকে

তারা বুর্জোয়া গঠনতন্ত্রের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রেখে বামজোটের সরকারকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার চেষ্টা করবে এবং এইভাবে সরকারকে জনসাধারণের সমর্থন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে, বামজোটের সরকার যখনই বামপন্থী কাজে হাত দেবে, তখনই কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তা ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। জনতা সরকারের শ্রেণীচরিত্র বিস্মৃত হলে মহাবিপত্তির সৃষ্টি হতে পারে।

এককথায়, জনগণের যারা শত্রু তারা বামজোটের সরকারেরও শত্রু— এই কথাটি মুহূর্তের জন্যেও ভুলে গেলে চলবে না।

একদিকে শ্রেণীশত্রুদের সম্পর্কে উদারতা যেমন হবে অমার্জনীয় অপরাধ, তেমনি বন্ধু শক্তিগুলি সম্পর্কে সংকীর্ণতা সমস্যা সমাধানের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করবে। যেহেতু এই রাষ্ট্রে একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র প্রবল, যেহেতু এই রাষ্ট্রে জোতদারেরা শক্তিশালী, তাই এখানে সহরে শ্রমিক আন্দোলনও প্রবল এবং গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কৃষক আন্দোলনও শক্তিশালী। সামন্ত-তন্ত্র-বিরোধী, পুঁজিবাদ-বিরোধী শক্তিগুলি এই বামজোটের সরকারের মিত্র। পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি প্রভাবশালী অংশ বামপন্থী মনোভাব-সম্পন্ন। এই বামপন্থী শক্তিগুলির এক অংশ যেমন বামজোটের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলির প্রভাবাধীন, তেমনি অপর অংশ সি-পি-আই, এস-ইউ-সি ও অন্যান্য পার্টি ও সংগঠনের প্রভাবাধীন হয়ে রয়েছে। যারা বামজোটের প্রভাবাধীন নয়, অথচ অন্যান্য বামপন্থী পার্টি বা শক্তির প্রভাবাধীন, তাদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা বামজোটের সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি ইতিমধ্যেই একযোগে কাজ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। বিধানসভার অভ্যন্তরে, বামজোটের সরকার যখনই কোনো বামপন্থী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেষ্টা করবে, তখনই কংগ্রেস ও জনতা পার্টি, তার বিরোধিতা করতে কাছাকাছি এসে যাবে—এই পরিস্থিতির জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। ঠিক সেই কারণেই বামপন্থী শক্তিগুলিকেও যথাসম্ভব মিলিত হয়ে কাজ করতে হবে। বামপন্থীদের মধ্যে ব্যাপক ঐক্য ছাড়া একচেটিয়া পুঁজি ও জোতদারদের যুক্ত আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করা অসম্ভব হবে।

শুধুমাত্র বামপন্থী শক্তিগুলি নয়, পশ্চিমবঙ্গে বিপুল গণতান্ত্রিক শক্তি আছে, যারা একচেটিয়া পুঁজি ও জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণে আগ্রহী।

তাঁরা কংগ্রেস অথবা যে পার্টিতেই থাকুন তাঁদের সহযোগিতা—বামজোটের সরকারের পক্ষে অপরিহার্য।

সর্বোপরি, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সম্পর্কে বামজোটের সরকারকে সব সময়ে সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভারতের দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের ছলাকলা নিতানতুন আকার ধারণ করছে। সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম কৌশল হবে বামজোটের সরকারকে আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের শক্তিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। "জাতীয় কমিউনিজমের" মনোমুগ্ধকর স্লোগানটির তারা গুণগান করবে, সি-পি-এম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ততই তার লাভ। আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের শক্তিগুলি সম্পর্কে নেতিবাচক বা নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণ করলে বামজোটের সরকার নিজেরই ক্ষতি-সাধন করবে।

আমরা আশা করব, এই সব সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থেকে বামজোটের সরকার সঠিক পথ গ্রহণ করবে।

সঠিক পথ গ্রহণ করতে পারলে এই সরকার সারা ভারতের শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে একটি নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারবে। অর্থাৎ অন্যান্য রাষ্ট্রের জনগণ—যেখানে কংগ্রেসের পরিবর্তে জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসেছে—তারাও ক্রমে বুঝতে পারবে যে, কংগ্রেসের সত্যিকারের বিকল্প জনতা পার্টি নয়, কংগ্রেসের বিপ্লবী বিকল্প হল বামপন্থী জোটের সরকার। সেই কারণে এই সরকারের সাফল্যের সঙ্গে সারা ভারতের বৈপ্লবিক রূপান্তরের সমস্যাটি জড়িত।

আমরা মনেকরি, পশ্চিমবঙ্গে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে, সি পি আই ও সি পি এম-এর মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে ঐক্যের ক্ষেত্র অনেক বেশী বিস্তৃত। দুটি পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম অবশ্যই চলবে, কিন্তু সেই সংগ্রাম যেন শ্রমিক-কৃষক নিম্ন মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে দুটি পার্টির মধ্যে ঐক্যকে ব্যাহত না করে। বর্তমানে দুই পার্টির মধ্যে পার্থক্যের ওপর জোর না দিয়ে ঐক্যের ওপর জোর দেবার আমরা পক্ষপাতী।

আমরা বামপন্থী, মার্কসবাদী, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই বামজোটের সরকারের প্রতি আমাদের মনোভাব ইতিবাচক। আমরা এই সরকার সম্পর্কে

সমর্থনের, সহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করব। সঙ্গে সঙ্গে আশা করব, এই সরকারও সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে থেকে পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করবে।

ভারত রুশ কথা ঃ বাঙালীর রুশ চর্চা। ডঃ কেশব চক্রবর্তী।
মনীষা : ১৯৭৬ : সাধারণ সংস্করণ : ২০·০০ টাকা।

লেখক তাঁর গবেষণার জন্য এমন একটি বিষয় বেছে নিয়েছেন, যা একাধারে গবেষক ও সাধারণ পাঠক উভয়েরই সমান আকর্ষণীয়। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল, একটানা পড়তে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। লেখক যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রমাণ রেখেছেন, তা পাঠকের সহজ স্বীকৃতি আদায় না করে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এ যেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস, একটি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশন। লেখক কি ধৈর্য নিয়ে অধুনা দুষ্প্রাপ্য অপরিচিত অসংখ্য পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে কত টুকরো টুকরো খবর সংগ্রহ করে তাকে একত্র গ্রথিত করে এক উপাদেয় বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। এমন একটি বিষয়ে অধ্যাপক চক্রবর্তী প্রথম হাত দিলেন, যা পরবর্তী গবেষকদের জন্য একটি আকর গ্রন্থ হয়ে থাকবে।

গবেষকের যে শৃঙ্খলাবোধ থাকে, তা অধ্যাপক চক্রবর্তী ভালভাবেই অনুসরণ করেছেন। প্রথমেই তিনি বিষয়ের সময়রেখা নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন—১৭৯৭ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌঁছেই তিনি ছেদরেখা টেনে দিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে এই সময়টা ভারতের পরাধীনতার কাল—ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন জেঁকে বসেছে; পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের সঙ্গে ভারতের পরিচয় হয় এটা ইংরেজের অভিপ্রেত নয়; ফরাসী জেকোবিনদের প্রভাব থেকে ভারতকে মুক্ত রাখতে চায়; অন্যদিকে দিগন্ত জোড়া রুশ দেশে ভারতত্ত্বের বিরুদ্ধে সে দেশে সাহিত্যে ও ঘটনার মধ্য দিয়ে যে আলোড়ন চলছিল, ইংরেজ তার থেকে ভারতকে আড়াল করে রাখতে চায়; এক কৃত্রিম লৌহ যবনিকা সে সৃষ্টি করেছিল রুশাতঙ্কের নামে; নিজের সাম্রাজ্যের স্বার্থের উদ্দেশ্যে, বলকান ও মধ্যপ্রাচ্যে যে বিরোধ, তার সঙ্গে ভারতকে সে জোর করে জুড়ে দিয়েছিল এবং রুশ-বিরোধী এক "সাইকোসিস" গড়ে তুলতে সক্ষমও হয়েছিল।

গোটা বিশ্বকে বাদ দিয়ে শুধু ইংলণ্ড, বড় জোর পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যেটুকু সাংস্কৃতিক সংযোগ গড়ে ওঠে, তার বাইরের জগতটা একেবারে অপরিচিত থাকবে, এই ছিল ইংরাজ প্রভুদের দেড়শ বছরের একটানা লক্ষ্য। তার ফলে আমরা একটু কুনো হয়ে গেছি; যেটুকু বাহিরের পৃথিবীকে জানি তাও ইংরাজের লেখা বই থেকে পরোক্ষভাবে, বিকৃত দর্পণে। একজন প্রাক্ বিপ্লব যুগের রুশ লেখকের লেখা পড়ে বর্তমান সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়। তিনি হচ্ছেন, বিশ্ববরেণ্য প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ সারবাটস্কী (Shcherbatsky)—তিনি এই "Europe-centric" approachকে পরিহার করতে ভারতীয় গবেষকদের উপদেশ দিয়েছেন। সারবাটস্কী ভারতে এসেছিলেন, কাশীতে বেদ অধ্যয়ন করেন। মহাযান বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অসাধারণ তাঁর অবদান, লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সংস্কৃত 'লেক্সিকন' প্রকাশিত হয়, তা আজও একমাত্র প্রামাণ্য অভিধান, ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা সারবাটস্কীর পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা দেখে বিস্ময়াবিষ্ট ও তাঁর কাছে নানাভাবে ঋণী। অধ্যাপক চক্রবর্তী কি কারণে জানিনা এই পণ্ডিত প্রবর সম্পর্কে আলোচনা তেমন করেন নি।

সেখানেই আশ্চর্য লাগে যে ভারতীয় তথা বাঙ্গালী মণীষা সেই সুদূর ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরাজের চক্রান্তের জাল ভেদ করে রুশ দেশের চিন্তা ও কর্মের বলিষ্ঠ ধারার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করেছিল এবং এপার ও ওপারের মধ্যে চীনের পাঁচিল টপকিয়ে সংযোগ ঘটিয়েছিল। রামমোহনকে পিটার দি গ্রেটের সঙ্গে তুলনা বা বিবেকানন্দ ও টলস্টয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার আকস্মিক নয়।

বিবেকানন্দ তো তাঁর গভীর ইতিহাস বোধ থেকে ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন যে আগামী দিনের বিশ্ববিপ্লব রাশিয়ায় বা চীনে হতে চলেছে। ঠিক এমনি কথা পাদ্রী লং সাহেব ১৮৭৩ সালের ২১শে অগাস্ট ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াতে লিখেছিলেন, "রাশিয়ার হাতে রয়েছে প্রচ্ছন্ন শক্তির উপাদান—যার সক্রিয় ফল আগামী শতাব্দীতে প্রকাশ পাবে।" "নীলদর্পণ"-এর প্রকাশ নিয়ে যে মামলা হয় তাতে লং-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা হয়—তার "dangerous pro-Russian tendencies"—তারপর থেকে কতবার এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

'রবীন্দ্র ভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী"তে লিখেছেন, "আমরা শুনিয়াছি যে তিনি রুশীয় ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন।" (পৃঃ ৪৬) এই তথ্যটি আমাদের গ্রন্থকারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বর্তমান সমালোচকের কাছে এ একেবারে অসম্ভব নয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর অনেকদিক থেকেই নূতন যুগের মানুষ ছিলেন। ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ তিন খণ্ডে যে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করেন, তাতে তিনি একটি তত্ত্ব তুলে ধরতে চেষ্টা করেন, তাহল এই যে, সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের ব্যবসাবাণিজ্য যখন বিদেশীদের কাছে হাতছাড়া হয়ে গেল, তখন স্থলপথে সুদূর মধ্য এশিয়া অঞ্চলে ভারতীয়দের ব্যবসাবাণিজ্য চলতে লাগল; জগৎ শেঠদের হুণ্ডি ভারতের বাহিরের রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্মানিত হত। রুশ দেশের মহাফেজখানা থেকে প্রকাশিত মুদ্রিত দলিলগুলি অনুবাদ করার পর ভারতীয়দের রুশ দেশে ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে অনেক তথ্য তাঁর মূল তত্ত্বের সমর্থনে পেয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর ফলে এই একটা দিক যা আপাতত জানবার আমাদের উপায় থাকল না। সন্দেহ নাই, ইংরেজ প্রভুরা অবশ্য শুল্ক বসিয়ে বা অন্য বাধা সৃষ্টি করে এই স্থলপথে ব্যবসাবাণিজ্য রুদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

দুইজন উদারপন্থী রুশ চিন্তানায়ক ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বসে যে বিপ্লবী চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন, এন. এ. ডব্রোলিউযোবোভ (N. A. Dobroluyubov) এবং অন্যজন এন. জি. চের্নাসেভেস্কি (N. G. Chernyshevsky); প্রথম জন বলেছিলেন, "India must be governed from India and for India, and not from England and for England" দ্বিতীয় জন লিখেছিলেন, "In Eastern India, for instance, however much the tiller of the soil may work, he, nevertheless, remains poverty-stricken."

কৌতূহল জাগে, এইসব লেখা সেন্সারের বেড়াজাল ডিঙিয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের হাতে এসে পৌঁছতে পেরেছিল কিনা ও তার ফলে কি সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল।

লেখক রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৫) এবং জাপানে বিস্ময়কে সঠিকভাবেই খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপক বিচারে ১৯০৫-৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রভাব আরও গুরুত্বপূর্ণ, এশিয়ার দেশগুলির দিক থেকে লেনিনের দুইটি লেখা "বিশ্ব রাজনীতিতে দাহ্যপদার্থ" এবং "এশিয়ার

আগরণ" উল্লেখ করতে চাই। এই সময় থেকে স্বদেশী আন্দোলনে নূতন একটি কথা শোনা গেল "রুশীয় পদ্ধতি" ব্যবহারের কথা, অর্থাৎ শ্রমিকরা যে পথ নিয়েছে, সেই ধর্মঘটের পথ গ্রহণ। এদিকটা লেখক তুলে ধরলে ভালই করতেন।

সবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ চর্চার দুই-একটা দিক তুলে ধরতে চাই। মিনায়েফ ও তাঁর সতীর্থ মিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েটের পালিভাষার সংকলন রচনা করে দেন; সেই সংকলন আজও অটুট আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন স্নাতকোত্তর পড়াশুনা শুরু করলেন স্যার আশুতোষ, তখন যেসব অধ্যাপকদের তিনি জড়ো করেছিলেন, তার মধ্যে একজনের নাম পাচ্ছি Paul Vinagradoff) অনুমান করি ইনি রুশ। অবনীন্দ্র ঠাকুরের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন অধ্যাপক শহীদ সুরাবর্দি, মেদিনীপুর জেলায় এঁদের বাড়ী, সুতরাং বাঙ্গালী, অক্সফোর্ড ও মস্কোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, পরিচয় গোষ্ঠীর অন্যতম। ইনি রুশ ভাষা থেকে একখানি বই অনুবাদ করেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা প্রকাশিত করেন: Muasulman Culture by V. D. Bartold (1934); চল্লিশের দশকের আগে এই অনুবাদ, পাছে ভুলে যাই, তাই উল্লেখ করছি।

নির্মলা বাগচী

বিয়োগপঞ্জী

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। সুনীতিকুমার বাঙলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বিশাল। তাঁর প্রতিভা, তাঁর মনীষা তাঁকে ক'রে তুলেছিল দেশের গৌরব। ভাষাবিদ হিসাবে, পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল বিশ্ববিস্তৃত। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সদালাপী। রাজনীতিতে তাঁর ছিল বুদ্ধিদীপ্ত কৌতূহল। আন্তর্জাতিকতাবোধ ছিল তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশের প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ছিলেন জড়িত। তাঁর মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হল তা সত্যিই অপূরণীয়।

তরুণ অপেরার নবতম প্রযোজনা।

শান্তিগোপাল

নির্দেশিত ও অভিনীত

রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা

রচনা—শম্ভু বাগ

সিপাই মিউটিনি

রচনা—মধু গোস্বামী

দৈনিক ও সাপ্তাহিক

কালান্তর

পড়ুন ও পড়ান

Problems Of National Liberation

Vol. II December, 1976 No. 1

Bengal Renaissance : A Neo-Colonialist Interpretation
—*Narahari Kaviraj*

Comintern and China (1925-27) :
Some Experiences in the United Front Tactics
—*Sobhanlal DuttaGupta.*

Jawaharlal Nehru and the League Against Imperialism
—*Horst Krueger*

Lenin and the New Left—*David H. DeGrood*

The Bhadralok Jotedar—*Sunil Sen*

On Mao Tse-Tung's Concept of New Democracy

Discussion :

Non-Capitalist Path in India : Some Implications.

(i) On the Question of Joint Leadership—*C. Rajeswar Rao.*

(ii) Is the National Bourgeoisie one of the Motive Forces of National Democratic Front ?—*S. Chaudhuri*

Book Review :

Rammohan Roy and the Process of Modernisation in India
—*Nirmalya Bagchi*

Explosion in a Subcontinent—*N. K.*

To be had of :

Manisha Granthalaya Pvt. Ltd.

Calcutta-700012.

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

Nava Bharat Enterprises Private Limited

Nilhat House Annexe

11 R. N. Mukherjee Road
Calcutta-700001

Regd. Office :

"Nava Bharat House"

6-3-654 Somajiguda
Hyderabad-500004

Other Branches :

BOMBAY ● COCHIN ● DELHI ● MADRAS
GUNTUR ● AGRA ● MORADABAD
BANGALORE

MULYAYAN
Vol. XIII. No. 1

Regd. No —WB/SC-16
R. N. 13785/65

এই প্রতীক কী এবং কেন?

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্— সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ই-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুলভে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্
আপনার সেবায়

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড্, কলিকাতা-১৬

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন
মূল্যায়ন
মূল্যায়ন

- অক্টোবর বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিন
- অক্টোবর বিপ্লব ও বর্তমান পৃথিবী
- জরুরী অবস্থা ও ভারতের অর্থনীতি
- বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিত
- জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কি বহুশ্রেণীক ?

আলোচনা ঃ

- জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৮৪

মূল্য ঃ দেড় টাকা

জমা টাকা বেড়ে উঠবে

৭ গুণেরও বেশী

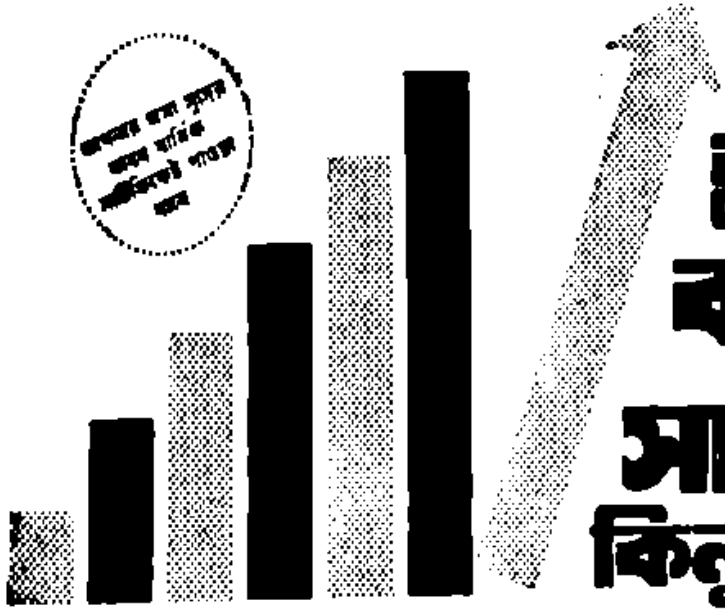

ইউনিআই ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

RSB-UBI-709

With Best Compliments from :

BENGAL POTTERIES LIMITED

Under Govt. of India Management

Makers of Fine Crockeries & Insulators
for domestic market as well as abroad

Regd. Office
25 Brabourne Road
Calcutta-700001.

Factory No. I :
45 Tangra Road,
Calcutta-700015.

Factory No. II :
3 Pagladanga Road,
Calcutta-700010.

তরুণ অপেরার প্রযোজনা

শান্তিগোপাল

নির্দেশিত ও অভিনীত

কার্ল মার্কস

রচনা : শম্ভু বাগ

সঙ্গীত : প্রশান্ত ভট্টাচার্য

ক্রীতদাস

রচনা : শম্ভু বাগ

সঙ্গীত : প্রশান্ত ভট্টাচার্য

রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা

রচনা : শম্ভু বাগ

সঙ্গীত : প্রশান্ত ভট্টাচার্য

সিপাই মিউটিনি

রচনা : মধু গোস্বামী

সঙ্গীত : পশুপতি ভট্টাচার্য

ফোন : ৫৫-৭১২১

Problems of National Liberation

A Journal of Theoretical Studies and Research

Vol -2 Dec. 1977 No. 2

In this issue :

- Influence of the October Revolution on the National Revolutionary Movement.
- Popular Agitation Against the British Policy of Taxation (1811).
- The State Sector on Developing Countries taking the Capitalist Path.
- Historic Significance of the Cuban Revolution.
- October Revolution : Reaction in India.

Discussion

- More on the Joint Leadership of the working class and the Bourgeoisie.
- Is National Democratic State a Multi-class State ?

Book Review

Oriental Countries Today, Vol.-I & II
—by A team of Soviet Scholars

Revolution in India—Path and Problems.
—by Mohit Sen.

Available at :

Manisha Granthalaya

4/3B Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12

Editorial Office :

10, Bondel Road, Calcutta-19

Price : Rupees Three only

মূল্যায়ন

বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৩,

১৩৮৪

সূচী

	পৃষ্ঠা
অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে / লেনিন	১
কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (৬) / রণেন সেন	৯
লি ত'-চাও (১৮৮৮-১৯২৭) / তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
রবিনসন ক্রুসো : মার্কসবাদী দৃষ্টিতে / সুকুমার মিত্র	২৭
অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে / এল. আই. ব্রেজনেভ	৫২
বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিত / সত্য রায়	৪৬
জরুরী অবস্থা ও ভারতের অর্থনীতি / চারুব্রত রায়	৫৫
জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কি বহুশ্রেণীক রাষ্ট্র ? / আর. ডি. জি	৬৭

আলোচনা

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা	৭১
বিয়োগপঞ্জী	৮৮

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

উপদেষ্টামণ্ডলী

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, পরিমলচন্দ্র ঘোষ, সুশীল জানা,

নির্মাল্য বাগচী, রণবীর দাশগুপ্ত ।

সম্পাদক

নরহরি কবিরাজ

পবিত্র রায় কর্তৃক ১০ বঙ্কিম রোড, কলিকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত ও

কালান্তর প্রেস, ৫০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে মুদ্রিত ।

মূল্যায়ন নিয়মিত পেতে হলে :

ডাকযোগে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া ভালো ।

চাঁদার হার—বার্ষিক ৯ টাকা ।

যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায় ।

মূল্যায়ন-এর এজেন্ট হতে গেলে :—

: কমপক্ষে পাঁচ কপি পত্রিকা নিতে হবে ।

: পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হবে ।

: ভি. পি. খরচ বহন করবে মূল্যায়ন ।

: এজেন্সী কমিশন দেওয়া হবে শতকরা ২৫% ।

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মাধ্যক্ষ

মূল্যায়ন

১০, বণ্ডেল রোড,

কলকাতা-১৯

লেনিন

অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে

এই মহান দিনটি যত দূরে সরে যাচ্ছে, ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে রাশিয়ায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের তাৎপর্য, আর ততই গভীরভাবে আমাদের কাজটার সমগ্র ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে ।

রাশিয়ায় বিপ্লবের সরাসরি ও আশু কর্তব্যটা ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক : মধ্যযুগীয়তার অবশেষগুলোর উচ্ছেদ, সেগুলোকে শেষ পর্যন্ত চূর্ণ করা, রাশিয়া থেকে এই বর্বরতা, এই লজ্জা, আমাদের দেশের সবকিছু সংস্কৃতি ও সবকিছু প্রগতির এই বাধাটার বিলুপ্তি ।

এবং সঙ্গতভাবেই আমরা এই গর্ববোধ করতে পারি যে বিলুপ্তির সে কাজটা আমরা করেছি ১২৫ বছরেরও আগে মহান ফরাসী বিপ্লবের চেয়ে বেশি দৃঢ়-ভাবে, বেশি দ্রুত, বেশি সাহস ও সাফল্যের সঙ্গে, এবং জনগণের উপর প্রতি-ক্রিয়ার দিক থেকে বেশি ব্যাপক ও গভীরভাবে ।

নৈরাজ্যবাদীরা ও পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা উভয়েই (অর্থাৎ এই আন্তর্জাতিক সামাজিক টাইপটির রুশী প্রতিনিধি হিসাবে মেনশেভিক ও স্যোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা) সমাজতান্ত্রিক (অর্থাৎ প্রলেতারীয়) বিপ্লবের সঙ্গে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পর্কের প্রশ্নে অবিশ্বাস্য রকমের বাজে কথা বহু বলেছে ও বলছে । এই ক্ষেত্রে আমাদের মার্কসবাদ বিষয়ক বোধের সঠিকতা, প্রাক্তন বিপ্লবগুলি সম্পর্কে আমাদের খতিয়ানের সঠিকতা চার বছরে পুরো প্রমাণিত হয়েছে । বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আমরা শেষ পর্যন্ত চালিয়েছি, যা কেউ আগে করে নি । পুরোপুরি সচেতন, দৃঢ় ও অটলভাবে আমরা এগিয়ে চলেছি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, এইটে জেনে রেখে যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে তা কোনো চীনের প্রাচীরে আলাদা হয়ে নেই, এইটে জেনে রেখে যে (শেষ বিচারে) কতটা আমরা সামনে এগুতে পারব, অপরিমেয়

বৃহৎ কর্তব্যটার কতটা অংশ পূরণ করব, বিজয়ের কতটা অংশ আমরা সংহত করতে পারব তার ফয়সালা হবে কেবল সংগ্রামেই। বেঁচে থাকলে তা দেখে যাব। কিন্তু এখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ব্যাপারে একটা উচ্ছল, অর্জিত ও পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে বিপুল কিছুই করা হয়েছে।

বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সারবস্তুর অর্থ মধ্যযুগীয়তা থেকে, ভূমিদাস-প্রথা থেকে, সামন্ততন্ত্র থেকে দেশের সামাজিক সম্পর্কের (ব্যবস্থাধারা, প্রতিষ্ঠানের) পরিশুদ্ধি।

১৯১৭ সাল নাগাদ রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথার প্রধান অভিব্যক্তি, জের, অবশেষে কী ছিল? রাজতন্ত্র, অধিকার-ভেদ, ভূম্যধিকার, ভূমি বন্দোবস্ত, নারীদের অবস্থা, ধর্ম, জাতিসত্তার পীড়ন। এই যে 'অগ্নীয় আস্তাবল' প্রসঙ্গত ১২৫, ২৫০ ও আরো বেশি বছর আগে (ইংলণ্ডে ১৬৪৯ সালে) তাদের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের সময় সমস্ত অগ্রণী রাষ্ট্রের বহুলাংশে পূর্ণপরিষ্কৃত না করেই রেখে দিয়েছিল, সেই অগ্নীয় আস্তাবলের যে কোনো একটা জিনিস ধরুন, দেখবেন আমরা তা পুরো সাফ করে ছেড়েছি। ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) থেকে শুরু করে সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া অবধি (৫ই জানুয়ারি, ১৯১৮) এই গোটা দশেক সপ্তাহের মধ্যেই এ ক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ও উদারনীতিকেরা (কাদেতরা) এবং পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা (মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা) তাদের ক্ষমতা আট মাসে যা করেছিল তার হাজার গুণ বেশি।

রাজতান্ত্রিক সমস্ত জঞ্জালটা আমরা এমনভাবে ঝেঁটিয়ে সাফ করি যা কেউ করে নি, কখনো করে নি। অধিকার-ভেদ ব্যবস্থার যুগ যুগের ইমারতটার একটা পাথর একটা ইঁটও আমরা বাকি রাখি নি (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানির মতো সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও আজ পর্যন্ত অধিকার-ভেদের চিহ্ন মোছে নি।) অধিকার-ভেদের সবচেয়ে গভীর মূল অর্থাৎ ভূমিসম্বন্ধ ও ভূমিদাসপ্রথার জের আমরা পুরোপুরি উৎপাটিত করে দিয়েছি।

ধর্ম অথবা নারীদের অধিকারহীনতা, অথবা অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির পীড়ন ও অসাম্যের কথা ধরুন। এ সবই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন। পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রের ইতরেরা আট মাস ধরে এই নিয়ে বুলি ঝেড়েছে; বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী দেশের কোনো একটিতেও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক

ধারায় এই সমস্ত সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয় নি। আমাদের দেশে তার পুরো সমাধান হয়েছে অক্টোবর বিপ্লবের আইনবিধিতে। ধর্মের সঙ্গে আমরা সত্যিকারের লড়াই চালিয়েছি ও চালাচ্ছি। সমস্ত অ-রুশ জাতিসত্তাকে আমরা দিয়েছি তাদের নিজস্ব প্রজাতন্ত্র অথবা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। নারীদের অধিকারহীনতা বা পূর্ণাধিকারহীনতার মতো নীচতা, অঘন্যতা ও পাষণ্ডতা আমাদের রাশিয়ায় নেই, নেই এই ভূমিদাসপ্রথা ও মধ্যযুগীয়তার বিরক্তিকর জের, যা বিনা ব্যতিক্রমে গোলকের সমস্ত দেশেই অর্ধ-ক্ষুদ্র বুর্জোয়া আর নির্বোধ ভীতিগ্রস্ত পেটিবুর্জোয়ারা নতুন করে তোলে।

এ সবই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সারবস্তু। দেড় শ' ও আড়াই শ' বছর আগে এই বিপ্লবের (একই সাধারণ টাইপের প্রতিটি জাতীয় প্রকারভেদ ধরলে, এই সব বিপ্লবের) অগ্রণী নেতারা মধ্যযুগীয় বিশেষাধিকার থেকে, নারীদের অসাম্য থেকে, কোনো এক ধর্মের (অথবা 'ধর্মের আইডিয়া', সাধারণভাবে 'ধর্মভাব') রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য থেকে, জাতিসত্তাগুলির অসাম্য থেকে মানবজাতির মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পূরণ করেন নি। পূরণ করতে পারেন নি, কেননা বাধা ঘটায়— — পবিত্র 'ব্যক্তিমালিকানার' প্রতি 'শ্রদ্ধা'। এই তিনগুণো অভিশপ্ত মধ্যযুগীয়তার প্রতি এবং এই 'পবিত্র ব্যক্তিমালিকানার' প্রতি এই অভিশপ্ত 'শ্রদ্ধাটা' আমাদের প্রলেতারীয় বিপ্লবে ছিল না।

কিন্তু রাশিয়ার সমস্ত জাতির জন্য বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই সুকৃতি-গুলিকে সংহত করার জন্য আমাদের আরো এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং এগিয়ে আমরা গেছি। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে সমস্যা, তার সমাধান আমরা করি আমাদের যাত্রাপথে, এগুতে এগুতেই, আমাদের পক্ষে যা প্রধান ও সত্যকার, প্রলেতারীয় ধরনে বৈপ্লবিক, সমাজতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, তার 'উপরি-উৎপন্ন' হিসাবে। আমরা চিরকাল বলে এসেছি যে সংস্কার হল বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রামের উপরি-উৎপন্ন। আমরা বলেছিলাম এবং কাজে দেখিয়েছি যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রূপান্তর হল প্রলেতারীয়, অর্থাৎ সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের উপরি-উৎপন্ন। প্রসঙ্গত বলি, 'আড়াই' মার্কসবাদের কাউৎস্কি, হিলফের্দিং, মার্তভ, চের্নোভ, হিলকুইট, ল'গে, ম্যাকডোনাল্ড, তেরাতি প্রমুখ সমস্ত বীরপুঙ্গবেরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ও প্রলেতারীয় সমাজ-

তাত্ত্বিক বিপ্লবের মধ্যে এই সম্পর্কটা বোঝেন নি। প্রথমটা বেড়ে ওঠে দ্বিতীয়তে। দ্বিতীয়টা তার যাত্রাপথেই সমাধান করে প্রথমের সমস্যা। দ্বিতীয়টা প্রথমের কর্ম সংহত করে। দ্বিতীয়টা প্রথমকে কতদূর ছাপিয়ে উঠবে তার সমাধান হয় সংগ্রামে এবং একমাত্র সংগ্রামে।

একটা বিপ্লব থেকে আরেকটা বিপ্লবে ছাপিয়ে ওঠার একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ বা অভিব্যক্তি হল সোভিয়েত ব্যবস্থা। সোভিয়েত ব্যবস্থা হল শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য সর্বোচ্চ গণতন্ত্র, এবং সেই সঙ্গে এটা হল বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে বিচ্ছেদ এবং গণতন্ত্রের নতুন বিশ্ব ঐতিহাসিক একটা টাইপের অর্থাৎ প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের বা প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অভ্যুদয়।

গর্ব করার অধিকার আমাদের আছে এবং এ গর্ব আমরা করব যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের নির্মাণ শুরু করার সৌভাগ্য, তাতে করে বিশ্ব ইতিহাসের নতুন একটা যুগ, সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে যারা নিপীড়িত, সর্বত্রই যারা চলেছে নতুন জীবনে, বুর্জোয়ার ওপর বিজয়ে ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বে, পুঁজির জোয়াল থেকে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে মানবজাতির পরিত্রাণের দিকে, তেমন একটা নতুন শ্রেণীর প্রভুত্বের যুগ শুরু করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রশ্ন, ফিনান্স পুঁজির যে আন্তর্জাতিক নীতি বর্তমানে সারা দুনিয়ায় প্রভুত্ব করছে, অনিবার্যই যে নীতি নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সৃষ্টি করে, অনিবার্যই মুষ্টিমেয় 'অগ্রণী' শক্তির হাতে দুর্বল, পশ্চাৎপদ ও ছোটো ছোটো জাতিসত্তার জাতীয় পীড়ন, লুণ্ঠন, দস্যুতা ও দলন অভূতপূর্ব রকমে বাড়িয়ে তুলছে, সে প্রশ্নটা ১৯১৪ সাল থেকে ভূগোলকের সমস্ত দেশের সমস্ত রাজনীতির মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ হল কোটি কোটি লোকের জীবন মরণের প্রশ্ন। আমাদের চোখের সামনে বুর্জোয়ারা যা তৈরি করে তুলছে, আমাদের চোখের সামনেই পুঁজিবাদ থেকে যা বেড়ে উঠছে, সেই পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটায় কি নিহত হবে ২ কোটি লোক (১৯১৪—১৯১৮ সালের যুদ্ধ ও তার পরিপূরক 'ছোটো ছোটো যে যুদ্ধ এখনো থামে নি তাতে নিহত ১ কোটির বদলে), অনিবার্য রূপেই আসন্ন (যদি বজায় থাকে পুঁজিবাদ) এই যুদ্ধে কি পঙ্গু হবে ৬ কোটি লোক (১৯১৪—১৯১৮ সালে পঙ্গু ৩ কোটির বদলে)—এই হল প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নে আমাদের অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসে নতুন যুগের উদ্বোধন করেছে।

এ বিপ্লবকে বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদীরা, জেনারেল আর মুদিরা, পুঁজিপতি

আর কূপমণ্ডূকেরা, ধর্মপ্রাণ সমস্ত খৃষ্টান আর দ্বিতীয় ও আড়াই আন্তর্জাতিকের সমস্ত মহারথীরা ক্ষিপ্ত হয়ে গালি দিতে চায় দিক। বিদ্বেষ, কুৎসা ও মিথ্যার কোনো তরঙ্গেই তারা এই বিশ্ব ঐতিহাসিক ঘটনাটাকে মুছে দিতে পারবে না যে শত শত ও হাজার হাজার বছর পরে গোলামেরা এই প্রথম গোলাম-মালিকদের মধ্যে যুদ্ধের জবাব দিয়েছে এই প্রকাশ্য ধ্বনি দিয়ে: লুঠের বখরার জন্য গোলাম-মালিকদের এই যুদ্ধকে পরিণত করব সমস্ত জাতির গোলাম-মালিকদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতির গোলামদের যুদ্ধে।

শত শত ও হাজার হাজার বছরে এই প্রথম এ ধ্বনি কাপসা ও অসহায় একটা প্রতীক্ষা থেকে পরিণত হয়েছে স্পষ্ট নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে, প্রলেতারিয়েতের পরিচালনায় লক্ষ লক্ষ নিপীড়িতের সত্যকার সংগ্রামে, পরিণত হয়েছে প্রলেতারিয়েতের প্রথম বিজয়ে, যুদ্ধ নির্মূলের যে ব্রত,—পুঁজির ক্রীতদাসদের ঘাড় ভেঙে, মজুরি শ্রমিকদের ঘাড় ভেঙে, কৃষকদের ঘাড় ভেঙে, মেহনতীদের ঘাড় ভেঙে যে বুর্জোয়া কখনো সন্ধি করে কখনো লড়ে, নানান দেশের সেই বুর্জোয়ার জোটের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের শ্রমিকদের জোট বন্ধনের যে ব্রত, তার প্রথম বিজয়ে।

এই প্রথম বিজয়টা এখনো চূড়ান্ত বিজয় নয়, আমাদের অক্টোবর বিপ্লব এ বিজয় অর্জন করেছে অদৃষ্টপূর্ব চাপ ও দুরূহতা অশ্রুতপূর্ব কষ্ট ও আমাদের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ প্রচণ্ড অসাফল্য ও ভুলের বিনিময়ে। নিজেদের ভুল স্বীকারে আমাদের ভয় নেই, শিক্ষালাভ ও সংশোধনের জন্য আমরা স্থির মস্তিষ্কেই সে ভুলের জন্য আমরা স্থির মস্তিষ্কেই সে ভুলের বিচার করব। কিন্তু ঘটনাটা ঘটনাই। শত শত ও হাজার হাজার বছরে এই প্রথম সমস্ত ও সর্ববিধ দাসমালিকদের বিরুদ্ধে দাসেদের বিপ্লব দিয়ে দাসমালিকদের যুদ্ধের 'জবাব দেবার' প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েছে পুরোপুরি—এবং সমস্ত দুরূহতা সত্ত্বেও পালিত হয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকার হাত থেকে জাপানী, জাপানের হাত থেকে মার্কিন, বৃটেনের হাত থেকে ফরাসী ইত্যাদি 'পিতৃভূমির রক্ষক' সারা দেশের পুঁজিপতি মহাশয়েরা চালিয়ে যান নিজেদের ভণ্ডামি! সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম উপায়ের প্রশ্নটা নতুন 'বাসেল ঘোষণাপত্র' দিয়ে (১৯১২ সালের বাসেল ঘোষণাপত্রের আদর্শে 'এড়িয়ে যেতে' থাকুন দ্বিতীয় ও আড়াই

আন্তর্জাতিকের মহারথী মহাশয়েরা এবং সারা বিশ্বের শান্তিবাদী পেটিবুর্জোয়া ও কূপমণ্ডূকেরা! সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব থেকে পৃথিবীর প্রথম দশ কোটি লোককে ছিনিয়ে এনেছে প্রথম বলশেভিক বিপ্লব। পরের বিপ্লবগুলি তেমন যুদ্ধ ও তেমন বিশ্ব থেকে মুক্ত করবে সমগ্র মানবজাতিকেই।

আমাদের শেষ কাজটা—কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে অসমাপ্ত কাজটা হল অর্থনৈতিক নির্মাণ, চূর্ণবিচূর্ণ সামন্ততান্ত্রিক ও অর্ধচূর্ণ পুঁজিবাদী ইমারৎটার জায়গায় নতুন সমাজতান্ত্রিক ইমারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ স্থাপন। এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে কঠিন কাজটায় আমাদের অসাফল্য ঘটেছে সবচেয়ে বেশি, ভুল হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এমন বিশ্ব ঐতিহাসিক নতুন কাজটা শুরু করতে গেলে কি আর অসাফল্য ও ভুল হবে না! কিন্তু কাজটা আমরা শুরু করেছি। কাজটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। ঠিক এইবারই আমাদের 'নয়া অর্থনৈতিক পলিসি' দিয়ে আমাদের একগুচ্ছ ভুল শুধরে নিচ্ছি, ক্ষুদে কৃষক এক দেশে সমাজতান্ত্রিক ইমারৎটার নির্মাণ কী ভাবে চালিয়ে যেতে হয় ভুল না করে, সেটা আমরা শিখে নিচ্ছি।

উদ্দীপনার তরঙ্গে উত্থিত হয়ে, প্রথমে জনগণের সাধারণ রাজনৈতিক ও পরে সামরিক উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তুলে আমরা সরাসরি ওই উদ্দীপনার জোরেই সমান বৃহৎ (সাধারণ রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তব্যের মতো) অর্থনৈতিক কর্তব্যকেও সাধন করার ভরসা করেছিলাম। আমরা ভরসা করেছিলাম অথবা বোধ হয় সঠিকভাবে বললে, যথেষ্ট বিচার না করেই আমরা অনুমান করেছিলাম যে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের সরাসরি আদেশেই একটা ক্ষুদে কৃষক দেশে কমিউনিস্ট ধরনে রাষ্ট্রীয় উৎপাদন এবং উৎপন্নের রাষ্ট্রীয় বণ্টনের সুব্যবস্থা করা যাবে। বাস্তব জীবন আমাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। দরকার হয়েছে একগুচ্ছ উৎক্রমণ পর্যায়ের—রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের, যাতে কমিউনিজমে উত্তরণের প্রস্তুতি করতে হবে দীর্ঘ বহু বৎসরের কাজের মাধ্যমে। সরাসরি উদ্দীপনা দিয়ে নয়, বরং মহা বিপ্লবে। প্রসূত উদ্দীপনাটার সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রেরণার ভিত্তিতে, অর্থনৈতিক হিসেবিয়ানার ভিত্তিতে আগে সেই সব [illegible]

পৌঁছে দেয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে ; তাছাড়া আপনারা কমিউনিজমে পৌঁছবেন না, তাছাড়া কোটি কোটি লোককে আপনারা কমিউনিজমে নিয়ে যেতে পারবেন না। এই কথা আমাদের বলেছে বাস্তব জীবন। এই কথা বলেছে বিপ্লব বিকাশের বাস্তব গতি।

এবং তিন-চার বছরে প্রচণ্ড মোড় নিতে পারার (যখন প্রচণ্ড মোড় নেওয়া প্রয়োজন হয়) খানিকটা শিক্ষা পেয়ে আমরা নতুন মোড় ফেরাটা, 'নয়া অর্থ-নৈতিক পলিসিটা' রূপ করতে শুরু করেছি সাগ্রহে, সমনোযোগে, অধ্যবসায় নিয়ে (যদিও এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট সাগ্রহে, যথেষ্ট মনোযোগে, যথেষ্ট অধ্যবসায়ে নয়)। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার, অধ্যবসায়ী ও বুদ্ধিমান এক "কারবারী", নিপুণ একপাইকারী বণিক হয়ে উঠতে হবে নইলে সে রাষ্ট্র ক্ষুদে কৃষক দেশকে অর্থনৈতিকভাবে খাড়া করে তুলতে পারবে না ; এই মুহূর্তে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী (এখনো পর্যন্ত পুঁজিবাদী) পশ্চিমের পাশে থেকে কমিউনিজমে পৌঁছবার অন্য কোনো পথ নেই। পাইকারী বণিক, এটা একটা অর্থনৈতিক টাইপ যার সঙ্গে কমিউনিজমের যেন বা আকাশপাতাল তফাৎ। কিন্তু এটা ঠিক সেই সব স্ববিরোধেরই অন্যতম যা বাস্তব জীবনে ক্ষুদে কৃষক অর্থনীতি থেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রেরণায় উৎপাদন বাড়বে ; যে করেই হোক না কেন, সর্বাগ্রে আমাদের দরকার উৎপাদন বৃদ্ধি। পাইকারী বাণিজ্যে অর্থনৈতিকভাবে সম্মিলিত হয় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে কৃষক, স্বার্থপ্রেরণা পায় তারা, গ্রথিত হয়, এগিয়ে যায় পরের পর্যায়ের দিকে—খোদ উৎপাদনের ক্ষেত্রেই সংযুক্তি ও সম্মিলনের নানা ধরনের দিকে। আমাদের অর্থনৈতিক পলিসির প্রয়োজনীয় অদলবদল আমরা শুরু করেছি। এক্ষেত্রে আমাদের বৃহৎ নয় সত্যি, আংশিক, তাহলেও নিঃসন্দেহ কিছু সাফল্য আছে। নতুন 'বিদ্যার' এই ক্ষেত্রটায় প্রাক-প্রবেশিকা ক্লাস আমাদের ইতিমধ্যেই শেষ হতে চলেছে। অটলভাবে ও লেগে থেকে শিক্ষা নিয়ে, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় নিজের প্রতিটি পদক্ষেপ যাচাই করে, বারবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে, ভুল সংশোধন করতে ভয় না পেয়ে, ভুলের তাৎপর্য গভীর ভাবে বিচার করে আমরা উত্তীর্ণ হব পরের ক্লাসেও। সমস্ত 'পাঠক্রমটাই' আমরা উত্তীর্ণ হব, যদিও বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশ্ব রাজনীতির ঘটনাচক্রে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের যা বাসনা তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ ও দুরূহ। যে করেই হোক না কেন, উৎক্রমণ কালের যন্ত্রণা, দুর্ভাগ্য, দুর্ভিক্ষ,

অবস্থা যত দুঃসহই হোক না কেন, আমাদের মনোবল হারাবে না, নিজেদের কর্মযজ্ঞকে আমরা নিয়ে যাব বিজয়ী পরিণতিতে।

১৪. ১০. ১৯২১ ৪৪শ খণ্ড, পৃ: ১৪৪-১৫২

"প্রাভদা" ২৩৪ নং

১৮ই অক্টোবর, ১৯২১

স্বাক্ষর : লেনিন।

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ—(৬)

রণেন সেন

বংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন—১১৩৪ সাল

আগের সংখ্যায় ১২৩৪ সালের ইতিবৃত্ত লিখেছি। তারই জের টেনে আরও ঘটনাবলী উল্লেখ করছি। আন্দামান সেলুলার জেলে সর্বাধিক (অন্য প্রদেশের তুলনায়) বন্দী ছিল বাংলাদেশ থেকেই। তখন কংগ্রেসী বা বিপ্লবী আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছে। সরকারী চণ্ডনীতি প্রচণ্ড। তা সত্ত্বেও ঐ বন্দীদের দেশের জেলে আনার জন্য দেশবাসীর মনোভাব প্রচণ্ড ছিল যেমন ছিল হাজার হাজার বিনা বিচারে রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে। গান্ধীজী এই দুই ব্যাপারের কোনটাতে মাথা ঘামাতে রাজী ছিলেন না। বাংলায় এইজন্য খুবই ক্ষোভ ছিল। বাংলার কংগ্রেসী নেতারা এই ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য গান্ধীজীকে বাংলায় আনতে চান। আসার তারিখ ও অন্যান্য কার্যক্রমও ঠিক হতে থাকে—যেমন কিভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে, কোথায় জনসভা হবে ইত্যাদি। খবরের কাগজগুলির মারফৎ বেশ সোরগোলও তোলা হল। আর এই ব্যাপারে সর্বমতের কংগ্রেসীরা ছিলেন, ডাঃ বিধান রায় থেকে খাদি প্রতিষ্ঠানের নেতারা পর্যন্ত।

গান্ধীবাদ বিরোধী লীগ গঠন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী

গান্ধীজীর কলকাতা সফরের কর্মসূচী জানবার আগেই বাংলাদেশে যারা ও যে যে দল গান্ধীজীর আন্দোলনের সমালোচক বা বিরোধী ছিল তাদের এক ঘরোয়া বৈঠক আমরা ডাকি। উপস্থিত ছিল রায়বাদী দল, লেবার পার্টি, আমরা ও বঙ্কিমবাবু-শিবনাথ ব্যানার্জি প্রভৃতি। প্রথম সভায় 'গান্ধী বয়কট কমিটি' নামে এক সংগঠন খাড়া করা হয়। ঠিক হয় যে গান্ধীজীর সভায় বা সম্বর্ধনায় জনগণ যেন না যায় সেই উদ্দেশ্যে সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি

মূল্যায়ন, বর্ষ ১২, সংখ্যা ১, ৪, ৫, এবং বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১, ২।

করা। এই রকম কয়েকটা সভা এই কমিটি যুক্তভাবে সংগঠিত করে। কংগ্রেসীরাও কয়েকটা জনসভার কর্মসূচী গ্রহণ করে। আমাদের গঠিত ঐ কমিটি উত্তরোত্তর জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ করতে থাকে ও কমিটির একটা সভায় বহুকট কমিটির নাম পরিবর্তন করে "লীগ এগেন্‌স্ট গান্ধীজম" (গান্ধীবাদবিরোধী কমিটি) নাম দেওয়া হয়। অর্থাৎ সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করা (যদিও এই দলগুলির কোনটাই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অংশীদার ছিল না) ও রাজবন্দী এবং আন্দামান বন্দীদের মুক্তির কোন কথা না বলার প্রতিবাদ থেকে আমরা একেবারে গান্ধীবাদের মূলনীতি, যথা অহিংসা, নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ, ওয়কা, সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ করা, বুর্জোয়ার স্বার্থ সংরক্ষিত করার চেষ্টা, (ভারতের উপকূলে বাণিজ্যে ভারতীয়দের অধিকার দেওয়া—গান্ধীজীর অন্যতম দাবী ছিল) ইত্যাদির মৌলিক প্রতিবাদের পথে পা বাড়ালাম। সৌমেন আমাদের সাথে যোগ দেয় নি, সে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করে "গান্ধীবাদ বিরোধিতাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা"।

আমাদের 'লীগের' দ্বারা অনুষ্ঠিত জনসভায় কিছু কিছু লোক জমায়েত হতে থাকে। কংগ্রেসীদের জনসভায় তার অপেক্ষা কম জনসমাগম হত। যাই হোক আমরা স্থির করলাম যে তাদের সভা দখল করতে হবে। তিনটি সভার কথা মনে আছে। এলবার্ট হলে কংগ্রেসী জনসভার মঞ্চে লাহিড়ী উঠেই বক্তৃতা শুরু করে দেয়। সভার চারিদিক থেকে আমরা 'গান্ধীবাদ বরবাদ' ধ্বনি দিতে থাকি। কংগ্রেসীরা সভা বন্ধ করে পলায়ন করে। দ্বিতীয়টি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জালালুদ্দিন হাশেমীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শান্তিরাম মণ্ডল মেদিনীপুর কংগ্রেসের সম্পাদকের দাড়ি ধরে এক ঝাঁকড় কষায়, আর হুদা টেবিলের উপর উঠে চিৎকার করতে থাকে 'এই কংগ্রেসী ফ্যাসিস্টদের চিনে রাখুন।' আমি বোধ হয় একটা ছোট বক্তৃতা দিই যার মধ্যে ধ্বনি দেই 'বৃটিশরাজ বরবাদ'। এই কারণে পুলিশ আমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা আনে ও আমার তাতে সাজা হয়। খোঁড়া হাশেমীতো ক্রাচে ভর দিয়েই কোনও রকমে পলায়ন করে। তৃতীয় সভা হাজরা পার্কে। সেখানে প্রথমে মিটিং শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি লিখিত একটা প্রস্তাব উত্থাপন করি এই মর্মে যে গান্ধীজী কলকাতায় এলে তাঁকে কালো পতাকা দেখান হোক্ এবং বক্তৃতাও দিতে থাকি। সভায় কংগ্রেসীরাও দলবদ্ধভাবে

এসেছিল। তাই ঠেলাঠেলি ও পরে হাতাহাতি হয়। পুলিশ সভা বেআইনী ঘোষণা করে। এবং কয়েকদিন পরে গেন্দা সিং, আমি, অজিত সিং (কিতী দল), শ্রীনারায়ণ কা (লেবার পার্টি) প্রভৃতি বেআইনী জমায়েত ও দাঙ্গার অপরাধে গ্রেফতার হই। লাহিড়ী তার কয়েকদিন আগেই রাজদ্রোহের (বোধহয় এলবার্ট হলের সভার ব্যাপারে) অপরাধে দণ্ডিত হয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হয়।

আমার নামে দুটি মামলায়ই ডাঃ দত্ত জামীনদার হন। তিনি আমাদের অনেকবার জামীনদার হয়ে হাজত বাস থেকে বাঁচিয়েছেন। আমাদের 'গান্ধীবাদবিরোধী লীগের শেষ সভা এলবার্ট হলে আমরাই ডাকি। সভার সভাপতি কে ছিলেন মনে নেই। কিন্তু সভার মঞ্চে বঙ্কিমবাবু, নীহারেন্দু, হালিম, হুদা, আমি ও অন্যান্য অনেকে উপস্থিত ছিলাম। গান্ধীজীর ক্রিয়া-কলাপ, মতবাদ, জাতীয় আন্দোলনের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা,' বন্দীমুক্তির ব্যাপারে মৌনতা প্রভৃতির নিন্দা করে তাঁকে কলকাতায় অবস্থানকালে কালো পতাকা দেখান হোক্ এই মর্মে একটা প্রস্তাব উপস্থিত করি, নীহারেন্দু সমর্থন করে। ইতিপূর্বে রজনী ও তার কয়েকজন অনুচর বলে ওঠে যে গান্ধীবাদের নিন্দা না করে শুধু বন্দীমুক্তির ব্যাপারটাই বলা হোক্। সভায় বচসা চলতে থাকে। আমি মঞ্চের প্রথম সারিতে বসা। মঞ্চের ঠিক নীচে পুলিস অফিসাররা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা (ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো) খগেন মুখার্জি ঠিক আমার সামনে বসা। তার পিছনে কলকাতার গোয়েন্দা অফিসাররা। খগেন মুখার্জি খুব খারাপ লোক বলে আমরা সবাই জানতাম। সে আস্তে আস্তে আমাকে বলে 'এঃ সামান্য একটা মিটিং চালাতে পারেন না, আবার রাজত্ব চালাবেন'। এমনি সভায় হট্টোগোলে কথা আমার বেশ গরম, তার উপর এই বিদ্রূপে আরও গরম হয়ে গেলাম। আমি উত্তরে বলি "তাতে আর আপনার কি? আপনি তো সেদিন দেখবেন না!" সে বলে "কেন দেখব না"। আমি বলি "তার আগেই তো আপনাদের গুলিতে প্রাণ যাবে"। সে প্রথমে চুপ করে থাকে, পরে চেঁচাতে থাকে "একে গ্রেফ্‌তার কর, আমায় গুলি করবে বলেছে"। আপনাদের মধ্যে কথা এত মৃদু হচ্ছিল যে আমার পাশে বসা নীহারেন্দুও শোনে নি আর অন্যদিকে অন্য পুলিশ অফিসাররাও না। নীহারেন্দু শুধু শোনে আমাকে গ্রেফ্‌তার করা হবে। সে একেবারে ইংরাজীতে চেঁচাতে থাকে। 'কোন আইনে', ইত্যাদি। হালিম তার

পাশে বসা। সে আস্তিন গুটিয়ে বলে "দেখি কে গ্রেফ্‌তার করে"? বঙ্কিমবাবু পিছনে বসা। আমার হাত ধরে পিছনে টেনে এনে বললেন "তুমি এখনি পালাও"। আমিও তৎক্ষণাৎ পিছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করতে যেয়ে দেখি দুটা সিঁড়িতেই লাল পাগড়ী পথ আগলে। আমি একেবারে ছাদে হাজির। কিন্তু কৌতূহল ছিল কি হচ্ছে দেখতে হবে। ছাদের খুলঘুলি খুলে দেখি যে সভায় হুটোপাটি আর নীহারেন্দু পুলিশের কার্যের তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা দিচ্ছে। তারপরই পুলিশ সভা বেআইনী ঘোষণা করে লাঠিচার্জ করে। হল খালি হয়ে গেল। কিন্তু ছাদ থেকে দেখি তখনও পুলিশ চারিধারে টহল দিচ্ছে। গেলেই ধরবে। প্রায় ঘন্টাখানেক পর দেখি কলেজ স্ট্রীট জনশূন্য এবং হুদা বোধহয় খেয়ে ৪১ নং-এ ফিরছে। আমি নেমে হুদার হাত ধরি। হুদা বলে, "শীগ্‌গির পালাও, শুধু গ্রেফতার নয় তোমায় ওরা পিটবে"। আমিও একেবারে চম্পট তৎক্ষণাৎ। তার পরের দিনে কাগজে দেখি বঙ্কিমবাবু, হালিম, হুদা, নীহারেন্দু, রজনী প্রমুখ কুড়ি জন ঐ সভার জন্য ধৃত আর আমায় পুলিশ খুঁজছে। কয়েকদিন পর রজনী জামিনে মুক্ত হলে আমি গোপনে দেখা করি। সে বলে যে পুলিস কমিশনার মিঃ কলভিন নাকি বলেছে যে রণেন সেনের ছাল ছাড়ান হবে। আমি আবার হাওয়া। কয়েক দিন পর বঙ্কিমবাবু জামীনে ছাড়া পেয়ে আমাকে খবর পাঠান যে এখন ধরা দিতে পারি, পুলিশের রাগ পড়ে গেছে। তারই দু-একদিন পরে আমায় পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে 'ইলিসিয়াম রো' (স্পেশাল ও ইন্‌টিলিজেন্স ব্রাঞ্চের আফস) নিয়ে যায়। কেউ কিন্তু কোন মারধর করে না, জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে রাজদ্রোহ, বেআইনী জমায়েত ও দাঙ্গার অভিযোগে আমার ছমাস কারাদণ্ড হয়। প্রেসিডেন্সী থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যাই। বিভিন্ন মামলায় হালিম, নিত্যানন্দ চৌধুরী, সরোজও জেলে গেল কয়েক-দিনের মধ্যে। আর এলবার্ট হলের ব্যাপার নিয়ে বিরাট এক মামলা চলল।

সেন্ট্রাল জেল থেকে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুকুমার সেন আই সি এস (স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রধান নির্বাচনী কমিশনার) এর আদালতে আমাকে হাজির করা হল। আমিই পয়লা নম্বর আসামী—মামলা ভারত সম্রাট বনাম রণেন সেন ও অন্য বিশজন—তার মধ্যে আসামী কমিউনিস্ট আন্দোলনে খ্যাত হালিম ও হুদা, জাতীয় ও টি উ আন্দোলনের

প্রখ্যাত বঙ্কিমবাবু, ইংলিশ বারের সভ্য (অর্থাৎ ব্যারিস্টার) নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ইত্যাদি।

সরকার পক্ষের অভিযোগ যে আমি পুলিশ অফিসার খগেন মুখার্জিকে আমার আঙুল পিস্তলের মত বাগিয়ে বলি যে তাকে গুলি করে মারব। আর অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা আমার এই কথায় সায় দিয়েছে। পাবলিক থেকে সরকার পক্ষ কোনও সাক্ষী হাজির করতে পারে না। আমাদের পক্ষে ব্যারিস্টার এন. আর. দাশগুপ্ত বঙ্কিমবাবুর অনুরোধে দাঁড়ান। ম্যাজিস্ট্রেট সুকুমার সেন আমার বক্তব্য শুনতে চাইলে আমি ইংরাজীতে জবানবন্দী দেই যে মিটিং এ গোলমাল চলাকালীন খগেন বিদ্রূপ করতে থাকলে আমি বলি "শাট আপ", সেটাকেই সরকার গুট বলে বিকৃত করে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। হাকিম তার রায়ে বলেন যে কোন ব্যক্তি আঙুল বাগিয়ে কাউকে যদি বলে যে গুলী করব তো সে হয় পাগল নয় বুদ্ধিহীন। আসামী রণেন সেনের আদালতে ব্যবহার ও জবানবন্দীতে বোঝা যায় সে এই দুটার কোনটাই নয়। সরকার পক্ষ বাইরের কোনও সাক্ষী দিতে পারে নি। বরং ব্যারিস্টার দাশগুপ্তের জেরায় অন্য পুলিশ অফিসারেরা বলতে বাধ্য হয়েছে যে তারা ভাল কিছুই শুনতে পায় নি। ম্যাজিস্ট্রেট মামলা খারিজ করে পুলিশকে তীব্র ভর্ৎসনা দেন। পরের দিন সমস্ত স্বদেশী পত্রিকায় হৈ হৈ, অমৃতবাজার তো সম্পাদকীয় লিখল। মামলাটা আসলে গান্ধীজীর ব্যাপারের সব চাপা পড়ে বৃটিশ সরকার ও পুলিশের ব্যাপারে দাঁড়ায়। বৃটিশ সরকার সুকুমার সেনের উপর ক্রুদ্ধ হয়। তার কিছুদিন পরেই তাঁকে জেলা জজরূপে হুগলীতে বদলী করে। এই রায় দেবার সাজা মিঃ সেন পেলেন।

ব্যাপারটা খুব খুঁটিনাটি মনে থাকার কারণ আমিই প্রথম এবং প্রধান আসামী এবং দেশে এই মামলা নিয়ে খুব হৈচৈ চলেছিল।

গান্ধীজীকে ডাঃ রায়রা এই গোলমালের পটভূমিতে আর হাওড়া স্টেশনে না নামিয়ে শিবপুরায় ট্রেন থেকে নামায়। সেদিনই তাঁকে বোধহয় বিকেলে দেশবন্ধু পার্কে সম্বর্ধনা সভায় নিয়ে যায়। তিনি কিছু বলার পর সভায় আমাদের লোকেরা গোলমাল শুরু করায় মিটিং বন্ধ হয়ে যায়। তিনিও সভাস্থল ত্যাগ করেন।

জাতীয় মহাফেজখানায় এ সম্পর্কে একটা দলিল পাই।

"File No 22/68/35 Pol. 1 - Home Pol. '35 Tele No 632 of 11. 3. 35 from Govt. of Bengal to Home Police ··

On 21.7.34 Gandhiji's meeting at Deshabandhu Park was disturbed. Leaflets from Calcutta Communists and League against Gandhism."

ফাইল নং ২২।৬৮।৩৫ রাজনৈতিক ১—পুলিশ রাজনৈতিক টেলি নং ৬৩২ তাং ১১।৩।৩৫ বাংলা সরকার থেকে রাজনৈতিক পুলিশ···

২১।৭।৩৪ তারিখে গান্ধীজীর দেশবন্ধু পার্কের সভায় গোলমাল হয়। কলকাতার কমিউনিস্টরা ও গান্ধীবাদবিরোধী লীগ-এর তরফ থেকে ইশ্‌তেহার দেওয়া হয়।"

এই মামলায় ছাড়া পেলেও পার্টির অনেকেই এবং আমিও আগের মামলায় কারারুদ্ধ হই। কলকাতা পার্টির প্রায় কেউই বাইরে থাকল না। একা ধরমবীর সিং অ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে রয়ে গেল।

জেল হওয়াতে আমরা একরকম দুবেলা খাওয়া ও রাত্রে নিশ্চিন্ত বাসস্থান পেলাম। বাইরে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। না ছিল খাবার পয়সা, না ছিল পরার জামাকাপড়, আর তার উপর সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পুলিশ ৪১নং এ চড়াও করত, বিভিন্ন সভা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হাজত খাটাত। প্রায় সন্ধ্যার পর অভুক্ত অবস্থায় কোনও বন্ধুর বাড়ি উঠতাম, বিশেষ করে জগদ্বিজত সরকারের বাড়ি রাত কাটাতাম বা বিজয় বোসের ডাক্তারী মেসে (বিজয় বোস ১৯৩০ সালে আমার সংস্পর্শে আসে ও পার্টি সভ্যপদ পায়)। মনে আছে আমার দুটা শার্ট, একখানা ধুতি ও একটা পাজামা ছিল, লাহিড়ীরও তদ্রূপ। আমার একটা শতরঞ্চী, লাহিড়ীর একটা তোষক ছিল, তাই পেতেই দুজন কত রাত ৪১নং কাটিয়েছি। হালিমই আমাদের মধ্যে মালদার—অর্থাৎ একটা পুরো বিছানা ও একটার বেশি ধুতি ছিল। আজকের পার্টিসভ্যরা এমনকি যারা ১৯৪৩ এর পরে পার্টিতে এসেছেন তারা ঐ দুঃখের ব্যথা বুঝবেন না। কিন্তু কোন কষ্ট কষ্টই মনে হত না যদি না পুলিশ হন্যে কুকুরের মত পিছনে লেগে না থাকত। যাই হোক জেলজীবন দুঃখের হলেও কয়েকমাসের মত নিশ্চিন্ত ছিলাম।

লি তা-চাও (১৮৮৮-১৯২৭)*

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯২৭ সালের ২৮শে এপ্রিল, চীনা সামরিকতন্ত্র লি তা-চাওকে হত্যা করে। লি-তা চাও ছিলেন, চীনের প্রথম মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচারক, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান বন্ধু এক কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদী।

তাইপিং, অ্যাডাম স্মিথ, রুশো, মন্টেস্কু, স্পেন্সার, হাক্সলি ও ডারউইনের আদর্শকে অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাকে যাঁরা মনে করতেন চীনকে বাঁচানোর সর্বরোগহর মহৌষধ সেই সব বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারার উত্তরসূরী ছিলেন লি তা-চাও। পরন্তু লি তা-চাও ও তাঁর সমসাময়িক গণতন্ত্রীদের চোখ থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মোহাচ্ছন্ন কেটেছে অনেকখানি, তাঁরা এ সম্পর্কে নির্মোহ হচ্ছিলেন, কেননা তাঁরা দেখেছিলেন বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা বৃহৎ শক্তির সহায়তাপ্রাপ্ত সামরিক প্রভুদের হাতে পড়ে কিভাবে চীনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল। অপরদিকে অক্টোবর বিপ্লবের মহতী জয় চীনা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার জগতে নতুন আলোড়ন এনেছিল। লি তা-চাও এই উভয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই গেছেন এবং দেখেছেন, যাচাই করেছেন।

অবশ্য লি-তা-চাওর পক্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করার পথ খুব সুগম হয় নি। এই পথ তৈরী করতে ব্যয় করতে হয়েছে প্রভূত সময়, বিপুল প্রয়াস, কঠোর অনুশীলন এবং ব্যবহারিক রাজনৈতিক সক্রিয়তা। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিটি সমকালীন চীনের সবচেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ইতিহাস, দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, তাত্ত্বিক রাজনীতি এবং সমাজবিজ্ঞান, সর্বক্ষেত্রেই এই

---

* লি তা-চাও। চীনের প্রথম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রচারক। কার ইউর্ন এ্যাকেয়ার্স। ৩য় সংখ্যা ১৯৭৭ অনুসরণে।

নিরভিমান ভদ্রলোকের উৎসাহ তাঁকে বসিয়েছিল চীনা শ্রমকশ্রেণীর প্রথম মতাদর্শগত নেতার আসনে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম মার্কসবাদীদের একজন রূপে।

লি তা-চাওর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বিবর্তনের বিশ্লেষণ তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় সূচিত করে ; প্রথম, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক (১৯০৭-১৮) ; দ্বিতীয়, উত্তরণ-কালীন (১৯১৮-২১) এবং তৃতীয়, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী (১৯২১-২৭)।

দরিদ্র কৃষক সন্তান লি'র জন্ম হোপেই প্রদেশের তাহিপো গ্রামে, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর। প্রাথমিক শিক্ষালাভ—গ্রাম্য বিদ্যালয়ে কনফুসিয় শিক্ষায়। দারিদ্র মাধ্যমিক শিক্ষা নিতে দেয় নি। ১৯০৭ সালে তিনি তিয়েনলিয়েন-এর আইন বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং জাপান থেকে আগত এক নতুন বিজ্ঞান 'পোলিটিক্যাল ইকনমি'র সঙ্গে পরিচিত হলেন। সেদিন থেকে তাঁর জিজ্ঞাসার আর সত্যান্বেষণের শুরু—কিভাবে তাঁর দেশকে দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা যায়।

১৯১১ সালের বিপ্লবের অব্যবহিতপূর্ব চীনের রাজনৈতিক আবহাওয়া লি তা-চাওকে রাজনীতির আবর্তে টেনে আনে এবং তাঁর মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তার স্ফুরণ ঘটায়। ১৯১৩ সালের ১লা এপ্রিল 'রেনচি' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'অপার বিষাদ' (গ্রেট সরো) এ-সময়কার চিন্তার চমৎকার প্রতি-ফলন তো বটেই তাঁর মতাদর্শগত বিকাশের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তও বটে। 'রাজতন্ত্র', 'বহুর উপর একের ইচ্ছার' দাসত্বের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা উদ্রেককারী রচনাটিতে যুবক লি তা-চাও'র ঘোষণা "স্বৈরতন্ত্র রাষ্ট্রকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং জনসাধারণের জীবনকে অপরিমেয় ক্লেশ ও দুর্দশায় পূর্ণ করে।"

এখানেই শেষ নয়, তাঁর চিন্তায় গণতন্ত্রে যে সত্যিই জনগণের স্থান সর্বোচ্চে তারও প্রকাশ এর উপসংহারে—যেখানে তিনি ১৯১১ বিপ্লব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন—"তথাকথিত জনগণের দ্বারা সরকার ব্যবস্থা অত্যাচারী কয়েকজনের একনায়কতন্ত্র ; দেশের সরকারে অংশগ্রহণকে এ (এই ব্যবস্থা) সর্বাংশে বাদ দেয়।"

১৯১৩ সালে লি তা-চাও গেলেন জাপান। ১৯১৩-১৬ এই তিন বছরের জাপান প্রবাসকাল তাঁর পরবর্তী বিকাশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অর্থনীতি অধ্যয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানা সমাজতান্ত্রিক

ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেন। বিশেষ করে রোটোপীয় সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তার একজন জনক সাঁ সিমঁ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

সেই সময়ের জাপান ছিল পশ্চিমী জগতের খুব কাছাকাছি, বিশেষ করে জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারে। জাপানে তিনি সুযোগ পেলেন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে জানার ও অধ্যয়নের। জাপানে তখন মার্কস-এঙ্গেলসের লেখার জাপানী অনুবাদ মোটামুটি বহুল প্রচারিত। তদুপরি ছিল জাপানী ও বিদেশী লেখকদের মার্কসবাদী প্রবন্ধসমূহ। চীনা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা নব-সংস্কৃতি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এর নীতি ছিল "জ্ঞানের জন্য ও গণতান্ত্রিক চিন্তা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য।" এরা আহ্বান জানিয়েছিলেন সর্বপ্রকার রক্ষণশীলতা, জাতীয় সংকীর্ণ-মনস্কতা এবং কল্পস্বর্গচিন্তাবিলাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের। এঁদের ধারণা ছিল, ঐতিহ্যবাদীতা দ্বারা আক্রান্ত নয় এমন তরুণ যাঁরা বিপ্লবী তত্ত্বের জ্ঞান-সমৃদ্ধ তাঁরাই পারবে দেশকে পুনর্গঠিত করতে। লি তা-চাও এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন ও স্বল্পকালের মধ্যেই সক্রিয় নেতায় পরিণত হন। ১৯১৬ সালের এপ্রিলে তিনি দেশে প্রত্যাবৃত হলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ইউয়ানকে সম্রাট ঘোষণা করার যুয়ান শি-কাই এর প্রচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়া দেশের প্রতি তাঁর প্রধান কর্তব্য।

এই সময়ে লেখা প্রবন্ধসমূহ তাঁকে করে তুলছিল যুবজনের মানসিকতায় সুদূরপ্রসারী প্রভাববিস্তারিদের প্রথম সারির একজন। বিশেষ করে কনফুসিয়স-বিরোধী লেখাগুলো যেমন তাঁর নিজের চিন্তা থেকে বস্তাপচা ঐতিহ্যকে পুরোপুরি বর্জনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল তেমনি রক্ষণশীল ঐতিহ্যবাদীতা পরিহার করতে তরুণদের প্রবল উৎসাহ জুগিয়েছিল।

যদিচ তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে গণতন্ত্রী এবং রাজতন্ত্র ও সর্বপ্রকার স্বৈরতন্ত্রের প্রবল বিদ্বেষী, এবং পুরনোকে বর্জন করে নবীন চিন্তার দ্বারা দেশকে মুক্ত করার প্রবক্তা, অথচ, এই সময়েও কিন্তু তিনি চীনা সমাজব্যবস্থাকে জনগণের প্রয়োজনে কিভাবে পুনর্গঠিত করা যেতে পারে তার কোনো হদিশ পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁর অন্বেষণ ছিল নিরন্তর।

চিন্তার ফসল তুলতে সর্বদাই প্রযত্নশীল তিরিশ-অনুর্ধ এই যুবক মনের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান স্রোতোধারারূপ এই প্রশ্নের জবাব পেলেন রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত-পূর্বে। তিনি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে

চীন দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর প্রমাণ মিলবে তাইপিংইয়াং পত্রিকার ১৫ই অক্টোবর ১৯১৭-র সংখ্যায় "হিংসা ও রাজনীতি" শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধে। এই লেখাতেই তিনি উদারনীতিবাদ ও পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার সঙ্গ ত্যাগ করেন পুরোপুরি। প্রবন্ধের উপসংহার টানতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যেখানে শাসকরা হিংসার আশ্রয় নেয়, সেসব দেশে বিপ্লব অনিবার্য; এবং যেহেতু চীন দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি হল হিংসা, "জনগণের ইচ্ছা" একমাত্র শক্তি অর্থাৎ বিপ্লবের মাধ্যমেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। সর্বোপরি, বিপ্লব বিরোধিতার ফল একটাই— বিপ্লবকে উৎসাহিত করা।

অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লবের মাত্র দিনকয়েক পূর্বেই লি তা-চাও বুর্জোয়া গণতন্ত্রে তাঁর মোহ পুরোপুরি ত্যাগ করেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে চীনের বিপ্লবী রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী।

বিপ্লবী গণতন্ত্র থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে উত্তরণের পর্যায়টি লি তা-চাও'র চিন্তায় ও কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে মূলতঃ মহান অক্টোবর বিপ্লব ও পুরনো ও নতুনের দ্বন্দ্ব হিসেবে। উত্তরণের চূড়ান্ত স্তরটি চিহ্নিত তাঁর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সক্রিয়তায়, বিশেষ করে ৪ঠা আন্দোলনের আগে-পরে ব্যবহারিক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণে।

১৯১৮ সালে ১লা জুলাই ইয়েনচি পত্রিকায় একটি পরম কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ লিখলেন তিনি: "ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের তুলনা।" চীনা গণতান্ত্রিক সাহিত্যে অক্টোবর বিপ্লবের বিশ্লেষণ এই প্রথম। বিপ্লব পরবর্তী রুশ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বললেন: "বিপ্লবী রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমূল পরিবর্তনকামী এক পার্টি কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ দখল এবং পুরনো রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর উৎখাত। চীন দেশে তিনিই প্রথম রুশ বিপ্লবের সুদূর-প্রসারী প্রভাব সম্পর্কে প্রকাশ্যে চিন্তা করলেন "রাশিয়ার এই বিপ্লব ইতিহাসের মহত্তম মোড় ফেরা সূচিত করছে এবং, ফরাসী বিপ্লবের মতই আগামী অনেক শতাব্দী ধরে সভ্যতার বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করবে।" ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ছিল স্বচ্ছ এবং রুশ বিপ্লবের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বললেন যে জাতীয়তাবাদী ফরাসী বিপ্লব নিরন্তর যুদ্ধ দ্বারা চিহ্নিত পুঁজিবাদী যুগের সূচনা করেছিল; পরন্তু, আন্তর্জাতিকতাবাদী রুশ বিপ্লব নিয়ে আসবে

সমাজতন্ত্র, যা শান্তির উৎস। "রুশ বিপ্লব একটি সমাজ বিপ্লব যা বিশ্ব জুড়ে জয়ী হবে।"

১৯১৮ সালের শেষদিকে লি তা-চাও শুরু করলেন বে-আইনীভাবে মার্কসবাদ প্রচার। এই প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে তিনি বেছে নিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। পরিচয় করালেন বিশেষ করে মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল'এর সঙ্গে। ১৯১৯-এর ৫ মে, তাঁর উদ্যোগে চেনপাও সংবাদপত্র মার্কস অধ্যয়ন বিভাগ খুলল। প্রকাশিত হতে থাকল মার্কস-এর রচনা-সমূহ ও মার্কসবাদের ওপর প্রবন্ধাবলী। ঐ বছরের মে সংখ্যা শিন্‌চিং-নিয়েন পত্রিকার সম্পাদন ভার পড়ল লি তা-চা'ওর ওপর। সমগ্র পত্রিকাটির আলোচ্য বিষয় ছিল কেবলমাত্র মার্কস ও মার্কসবাদ। লি তা-চাও নিজে লিখলেন "মার্কসবাদ সম্পর্কে আমার ধারণা।" ইতিহাস-চিন্তা, অর্থনীতি চিন্তা এবং রাজনীতি ও সমাজতন্ত্র চিন্তা এই তিনটি মূল ভাগে মার্কসবাদকে আলোচনা করে লি দেখান যে এরা শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা দ্বারা পরস্পর-আশ্রিত। কিছু কিছু পুরনো চিন্তার অবশেষ রয়ে গেলেও চীনা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনার অন্যতম এই লেখাটি।

এই সময়ে লি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গঠা মে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন ও ছাত্রদের মতাদর্শগত প্রেরণাদাতা ও নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এই সময়েই তিনি প্রথম একজন রুশ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ পান। এই ভদ্রলোক, ন. বার্টম্যান, তাঁকে পরিচিত করান লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' গ্রন্থটির সঙ্গে। লেনিনের এই লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে লি তা-চাও এই সময়েই তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে তীক্ষ্ণ আক্রমণ শুরু করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্র নিয়ে চিন্তা ও উৎসাহ তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল এই সময়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নিয়ে গভীরতর অধ্যয়নে। এই পর্যায়ে অর্থাৎ এক ১৯২০ সালে তিনি পাঁচটি প্রবন্ধ লেখেন, যার সবগুলিই ছিল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা।

চীনদেশে তখন মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা ও সমাজতন্ত্র সম্পর্ক আগ্রহ শিকড় গাড়ছে এবং কমিউনিস্ট আদর্শ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের এক বড় অংশকে নাড়া দিয়েছে। এরই পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণ কমিউনিস্ট

আন্দোলনের ভূমিষ্ঠ হবার আয়োজন সুসম্পূর্ণ করছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দূতদের সহায়তায় ১৯২০ সালের মে মাসে সাংহাইতে চেন্ তু-শিউর নেতৃত্বে একটি কমিউনিস্ট চক্র গঠিত হয়। এর পরেই হয় পিকিং-এ। লি তা-চাও ছিলেন এর অন্যতম সংগঠক।

১৯২০ সালের হেমন্তে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতান্ত্রিক অধ্যয়ন-গোষ্ঠীর সংগঠন চীনদেশে মার্কসবাদকে জনসাধারণ্যে প্রচারের দিকে এক নবীন বসন্তের আগমন-বার্তা নিয়ে এলো। লি তা-চাও ছিলেন এর প্রধান, এর অধিবেশনে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নিয়ে বক্তৃতা-পাঠ করতেন।

তিনি ও তেঙ চুঙ-শিয়া ১৯২০ সালে চীনদেশে প্রথম শ্রমিকদের মে-দিবস সংহতি উৎসবের আয়োজন করেন। ১৯২১ সালের জুন মাসের গোড়ায় কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিও সমবেত প্রচেষ্টায় নিখিল চীন ট্রেড ইউনিয়ন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ইউনিয়ন সংগঠন করা এবং স্ট্রাইক ইত্যাদি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন পরিচালনা।

চীনে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলায় লি তা-চাও ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। তিনি শ্রমিকদের সংগঠিত করতেন, মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করতেন ও কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর জন্য প্রকাশিত পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

এই সময়ে আরেকটি বিষয় নিয়ে তিনি গভীর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন যার থেকে তার আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তার পরিচয় মেলে। পিকিং-এ প্রথম মার্কসবাদী গোষ্ঠী তৈরী করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল এই সংগঠনের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের যোগাযোগ অপরিহার্য। কেননা, চীন বিপ্লব ও এর অর্থনৈতিক ভিত্তির জন্য আন্তর্জাতিকের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অমূল্য অবদান রাখতে পারে।

পূর্ববর্তী সময়ে মার্কসবাদ প্রচার ও বিপ্লবী ভাবনা নিয়ে যে বিরাট গোড়া-পত্তন হয়েছিল, তার ফলে অত্যল্পকালের মধ্যেই শ্রমিকদের শ্রেণী সংগঠন যেমন বাড়ছিল, তেমনি বেড়ে চলেছিল কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ ও প্রভাব। এক বছরের মধ্যেই সাংহাই ও পিকিং ছাড়াও, মার্কসবাদী গোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়েছিল য়ুহান, চাংসা, ও সিনানে। এছাড়া, ততদিনে জাপান ও ফ্রান্সেও চীনা কমিউনিস্টদের গোষ্ঠী কাজ শুরু করেছিল।

কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রয়োজন

দেখা দিয়েছিল। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে সাংহাইতে চীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস বসল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা লি তা-চাও'এর মতাদর্শগত বিকাশকে গভীর প্রভাবিত করেছিল ও ত্বরণ ঘটিয়েছিল। লেনিন ও লেনিনবাদ সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা এর প্রত্যক্ষ ফল। কোনোরকম বাহুল্য ব্যতিরেকেই একথা বলা যায় যে, লি তা-চাওই প্রথম ব্যক্তি যিনি চীনদেশের বিপ্লবের পক্ষে লেনিন ও লেনিনবাদের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। লি'র মতাদর্শগত রাজনৈতিক বিস্তার বিকাশে প্রত্যক্ষ ছাপ রেখেছিল লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব', 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি', 'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি' এই সব রচনাবলী এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতাসমূহ।

চীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের জন্যই বিশেষ করে তিনি লেনিনের জীবনী লিখেছিলেন। সেই কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এই জীবনীতে লি তা-চাও বিশেষ করে জোর দিয়েছেন, লেনিনের রচনাসমূহ ও নির্দেশগুলিকে সযত্নে অনুশীলনের জন্য।

১৯২১ পরবর্তী বছরগুলি লি তা-চাও'র পক্ষে যেমন, তেমনই চীন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষেও বিরাট বিরাট কর্মকাণ্ডের সময় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এই সময়ে লি তা-চাও ভাবছিলেন নানা তত্ত্বগত সমস্যার কথা। এই ভাবনার নিরিখ পাওয়া যায় ফেই চুয়ে-তিয়েন-এর নিকট লেখা এক চিঠিতে। এই চিঠিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন চীনে সমাজতন্ত্র নির্মাণ সম্ভব কিনা। প্রবন্ধাকারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই চিঠিতে তিনি এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত। কোন দেশের পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সেই দেশের বিকাশের স্তরের ওপর নির্ভর করে না; পরন্তু, বিশ্ব অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের অস্তিত্বের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন: "বস্তুগত মূল্যের প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের, নিজ দেশের শোষক শ্রেণীগুলিকে উচ্ছেদের জন্য, বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠনের জন্য" অবশ্যই "সরকার তৈরী করতে

হবে।" অর্থাৎ, তিনি চীন দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণের উদ্দেশ্যে শ্রমজীবী জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি তুলে ধরেন।

১৯২২ সালের জুলাই মাসে সাংহাইতে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গোপনে বে-আইনীভাবে লি তা-চাও এতে যোগ দেন এবং পাঁচজনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন চেন তু শিউ (সাধারণ সম্পাদক) এর সঙ্গে। এই কংগ্রেসের পর কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার কাজে জোর দেয়। উত্তর চীনে এর দায়িত্ব ছিল লি'র পর। তিনি ও তেঙ্ হুঙ্-লিয়া উত্তর-চীন রেলপথগুলির শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজে ও রেল-শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট তৈরী করার অভিযান শুরু করেন। ১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারীতে উত্তর চীনের রেল-শ্রমিকরা স্ট্রাইক করে। এর নেতৃত্ব দেন লি তা-চাও। অবশ্য স্ট্রাইককে দমন করা হল নির্মমভাবে এবং লি পালাতে বাধ্য হলেন দেশের দক্ষিণাঞ্চলে।

এই সময়ে তিনি প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা নিয়ে ভাবছিলেন এবং ক্রমশঃই এই দিকে ঝুঁকছিলেন। অবশ্য সেই সময়ে লি তা-চাও এটা প্রকৃষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি যে চীনের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব যা প্রলেতারিয় একনায়কত্বের পথ প্রস্তুত করবে।

১৯২৩ সালের বসন্তে ক্যান্টনের সরকারের প্রধান হলেন সান ইয়াৎ-সেন। এর ফলে কমিউনিস্ট পার্টি দক্ষিণ চীনে প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পেল। পার্টির সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হল ক্যান্টনে এবং সেখানেই পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯২৩ সালের জুন মাসে। এই কংগ্রেসের আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল কুয়োমিন্টাং-এর প্রতি কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী। অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে লি তা-চাও ও চেন তু-শিউ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় একটিমাত্র ফ্রন্ট গঠন করে শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার ওপর জোর দেন ও পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুমোদনের বাঞ্ছনীয়তার কথা জোরের সঙ্গে তুলে ধরেন। কুয়োমিন্টাং সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব সংক্রান্ত কমিন্টার্ন কার্যনির্বাহী পরিষদের ১২ই জানুয়ারী ১৯২৩ এর প্রস্তাবকে লি সমর্থন জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বেই, ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে আরো কয়েকজন কমিউনিস্টদের সঙ্গে লি তা-চাও ব্যক্তিগতভাবে কুয়োমিন্টাং-এ যোগ দিয়েছিলেন।

১৯২৪ সালের জানুয়ারীতে কুয়োমিন্টাং-এর প্রথম কংগ্রেসে লিউ তা-চাও গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী কুয়োমিন্টাং সদস্যদের আক্রমণকে বিফল করে দেন তাঁর জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে। তিনি বলেন যে, কমিউনিস্টরা কুয়োমিন্টাং-এ এসেছে দখলের উদ্দেশ্যে নয়, পরন্তু দেশব্যাপী একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য। কুয়োমিন্টাং-এর ঢিলেঢালা ভাব কাটিয়ে একে সুসংগঠিত সংগঠন গড়ে তোলায় যে দুজনের নাম অগ্রগণ্য তাঁর একজন হলেন লি ও অপর জন কমিন্টার্নের প্রতিনিধি মিখাইল বোরোদিন। কুয়োমিন্টাং-এর প্রথম কংগ্রেসের পর সোভিয়েত-চীন বন্ধুত্ব প্রসারের সুযোগ পাওয়া গেল এবং দু দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন মোকাবেলা করার জন্য একটি সাধারণ নীতির ভিত্তিতে সই করল দুই দেশ ১৯২৪ সালের ৩১শে মে, পিকিং-এ। এর পেছনে লি তা-চাও'র অবদান অনেকখানি।

১৯২৪ সালের বসন্তকালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৫ম কংগ্রেসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে লি সোভিয়েত ইউনিয়ন যান এবং সেখানে দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে রুশ বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ প্রয়াস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করার চেষ্টা করেন।

দেশে ফিরে আবার তিনি ব্যবহারিক রাজনৈতিক কাজকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স্থানীয় সামরিক প্রভুদের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। অবশেষে, ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে উ পেই-ফে'র গোপন গোয়েন্দা সংস্থার হাতে তিনি গ্রেপ্তার এবং জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা ততদিনে এমনই আকাশচুম্বী যে বাধ্য হয়ে তাঁকে মুক্তি দিতে হল।

১৯২৫ সালের জানুয়ারীতে সাংহাইতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ৪র্থ কংগ্রেসের অধিবেশন হল। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ছিল যে চীন দেশ জাতীয় বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বে কৃষককে বিপ্লবী সংগ্রামের দিকে নিয়ে আসা এখনকার মূল কাজ। কেন্দ্রীয় কমিটিতে পুনর্নির্বাচিত লি তা-চাও নতুন কাজের ও চিন্তার ভার নিয়ে ফিরলেন। এবার তিনি কৃষকদের সংগঠিত করার দিকে আত্মনিয়োগ করলেন। অবশ্য

১৯১৯ সালেই তিনি কৃষকের মুক্তির প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছিলেন, এবং বলেছিলেন, কৃষককে মুক্ত না করে জাতির মুক্তি সম্ভব নয়।

১৯২৫ সালের স্বল্পকাল পূর্বে সান ইয়াৎ-সেন পিকিং এলেন, এবং চীনদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের সংগ্রাম নিয়ে লি তা চাও'র সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালালেন। লি তা-চাও'র উদ্যোগে জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল এসেম্বলী) গঠনের জন্য কমিটিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মেলন ডাকা হল ১৯২৫ সালের ১লা মার্চ। তাঁর সভাপতিত্বে সম্মেলন সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকতন্ত্রবিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের এক কর্মসূচী প্রণয়ন করল।

১৯২৫ সালে মার্চ মাসে সান ইয়াৎ-সেন মারা গেলেন। চীনের পরিস্থিতিও ঘোলাটে হয়ে উঠল। কুয়োমিন্টাং-এর মধ্যে দক্ষিণপন্থীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারা প্রকাশ্যে দাবী জানাচ্ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে। সান ইয়াৎ-সেনের মতাদর্শগত অবস্থান ও উত্তরাধিকার নিয়ে দলের ভিতরে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে, সাংহাই, হংকং এবং ক্যান্টনে কারখানা শ্রমিকদের স্ট্রাইক, ১৯২৫ এর মে'তে সিংটাও ও সাংহাইতে শ্রমিক ও বিক্ষোভকারীদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ১৯২৫-২৭ এর বিপ্লবের পথ করে দিল।

সেই সময় প্রয়োজন ছিল কুয়োমিন্টাং ও সান ইয়াৎ-সেনের মতাদর্শগত উত্তরাধিকার সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীকে জনসমক্ষে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা। ১৯২৬ সালে লি তা-চাও সান ইয়াৎ-সেন সম্পর্কে দুটি রচনা প্রকাশ করলেন, "চীনা জাতীয় বিপ্লবের ইতিহাসে সান ইয়াৎ-সেনের ভূমিকা" ও সান ইয়াৎ-সেনের মতবাদে জাতীয় বিপ্লবের মতবাদ ও বিশ্ববিপ্লব।"

১৯২৫-২৭ এর বিপ্লবের কালে এই গ্রন্থ দুটির মূল্য ছিল অপরিমেয়। তিনি বিপ্লবী জনগণকে দেখালেন যে তাদের বিপ্লবী ঐতিহ্য ও বিশ্ববিপ্লব কিভাবে সান ইয়াৎ-সেনের জাতীয় বিপ্লবী মতবাদকে গড়ে তুলেছিল। তিনি প্রমাণ করলেন যে "সান ইয়াৎ-সেন" বিপ্লবকে শ্রমিক-কৃষক জনতার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং চীন বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বের বিপ্লবী জনগণের বৃহত্তর ঐক্য সাধনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন।" তিনি এও বললেন যে চীনের জাতীয় বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবেরই অংশ।

অন্য আর একটি দিক থেকেও এর গুরুত্ব অনন্যসাধারণ। দক্ষিণ-

পন্থী কুয়োমিন্টাং সদস্যদের সমালোচনার মাধ্যমে লি তা-চাও'র নিজের যে চিত্রটি ফুটে উঠল তা হল একজন প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদীর। এই লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন যে ১৯২৫-২৭-এর চীনের বিপ্লবের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রলেতারিয় আন্দোলনের সংহতি স্থাপনের কথা।

লি তা-চাওকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা বলতে চায় ঠিক এ সময় থেকেই নাকি তিনি জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। অথচ লি তা-চাও বারেবারেই বলেছেন জাতীয়তাবাদ হল "যুদ্ধের উৎস" এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ "শান্তির"। স্বদেশে প্রতি ভালোবাসা আসে জাতীয়তাবাদ থেকে এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য চিন্তার উৎস হল আন্তর্জাতিকতাবাদ।

বিপ্লবের বিকাশ ও বিস্তৃতি জাতীয় বিপ্লবের শিবিরে তীক্ষ্ণ বিরোধের সৃষ্টি করে। ১৯২৭ এর বসন্তকালে কমিউনিস্ট, টেড ইউনিয়ন-সভ্য ও বামপন্থী কুয়োমিন্টাংদের ওপর সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। ইতিপূর্বেই, ১৯২৬ সালের ১৮ই মার্চ, পিকিংএ লি তা-চাও ও অন্যান্য কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত এক গণ মিছিলের ওপর গুলী চালানো হয়। ঘৃণিত একনায়ক চাং সো-লিন ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই মিছিল শাসকদের উন্মত্ত করে তুলেছিল। মাথায় আঘাত নিয়ে লি তা-চাও গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। এই অবস্থাতেই তিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির উত্তরাঞ্চলের সেক্রেটারী ও কুয়োমিন্টাং-এর পিকিং শাখার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও তার পদলেহী অনুচররা তখন চণ্ডে হয়ে উঠছে। সোভিয়েত দূতাবাসে কয়েকজন কমিউনিস্ট বন্ধুর সঙ্গে আত্মগোপন করেছিলেন লি তা-চাও। সেখানে প্রবেশ করে বন্ধুদের সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় চাং সো-লিনের সৈন্যরা। এ ঘটনা ১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিলের, চালনা হয় জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্মম অত্যাচার। কিন্তু আজীবন বিপ্লবীকে অবদমন করা গেল না।

পরিস্থিতি তখন দ্রুত পাল্টাচ্ছে। সাংহাইতে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান হল। নেতৃত্ব ছিল চিয়াং কাই শেকের। ১৮ই এপ্রিল চিয়াং কাই শেক নানকিং-এ প্রতি-বিপ্লবী সরকার স্থাপন করল।

১৯২৭ সালের ২৮শে এপ্রিল অর্থাৎ উহান-এ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ৫ম কংগ্রেসের অধিবেশন শুরুর পরের দিন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জল্লাদ লি তা-চাও ও তাঁর কমরেডদের দেশব্যাপী গণ বিক্ষোভ সত্ত্বেও এবং কোন-রকম বিচার ছাড়াই নৃশংস হত্যা করল। লি তা-চাও'র নাম চীন বিপ্লব ও বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে অমর অক্ষরে লেখা হয়ে থাকল।

লি তা-চাও ছিলেন চীনের প্রথম এবং এশিয়ার প্রথমদের অন্যতম যিনি সব সময়ের বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এবং এই প্রয়াসের ফলে দুর্গম পথ বেয়ে বিশ্বকে নতুন রূপ দেবার সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অস্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। চীনের জনগণের সামনে তিনি মেলে ধরেছিলেন এক সম্ভাবনাপূর্ণ জগতের নতুন উষাকে।

রবিনসন ক্রুসো ঃ মার্কসবাদী দৃষ্টিতে

সুকুমার মিত্র

"সমাজের সামন্ততান্ত্রিক রূপের বিলুপ্তি এবং ষোড়শ শতাব্দী থেকে গড়ে ওঠা উৎপাদনের নতুন শক্তিগুলির যুক্ত হল অষ্টাদশ শতাব্দীর এই মানুষটি—যার অস্তিত্ব হল অতীতের—এক আদর্শরূপে দেখা দিয়েছিল—ইতিহাসের ফলস্বরূপ নয়, বরং তার সূচনারূপে।"

—কার্ল মার্কস

ইংল্যাণ্ডে যখন ধনিক সভ্যতার জয়যাত্রা শুরু হয়েছে ; শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যে এসেছে প্রবল জোয়ার ; সেক্সপীয়র, মিলটন, সুইফট প্রমুখ বিশ্ববন্দিত লেখকরা যখন তাঁদের সাহিত্য-সম্ভার উজাড় করে দিয়েছিল মানুষের কাছে তখন ইংল্যাণ্ডের সেই কলরোলমুখর জীবনস্রোতে পা ভাসিয়ে দেখা দিয়েছিলেন ড্যানিয়েল ডিফো। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে "সিটি অব লণ্ডন" বলে অভিহিত লণ্ডনের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রের ফোর ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে ডিফো জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মাংসের কারবারী অর্থাৎ কসাই। মহাকবি মিলটন তখনও বেঁচে এবং এক সময় তিনি এই মাংস ব্যবসায়ীর প্রতিবেশীরূপে কিছুকাল কাটান। ছেলেকে ডিফোর বাবা লেখাপড়া বেশ ভালভাবেই শিখিয়েছিলেন। ছেলে গীর্জার ধর্মগুরু হবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। জন্মস্থানের প্রভাব বেশ ভালভাবেই ছেলের উপর পড়েছিল। তরুণ ডিফো উপলব্ধি করেছিলেন অর্থ অনর্থক নয়, অর্থ না থাকলে ধর্মকর্ম সবই বৃথা। তিনি কর্নহিল-এর ক্রীম্যানস্ ইয়ার্ড এ মোজা রপ্তানীর কারবারে নেমে পড়লেন। তাঁর কর্মবহুল জীবনে কখনও তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন, কখনও বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন, অবশ্য তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের বেশীর ভাগটাই কেটেছে দুঃখকষ্টের মধ্যে। শেষজীবনে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েন, ১৭৩০ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু একটি নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল—লেখার নেশা। সহস্র কাজের মধ্যেও শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন। সর্বসাকুল্যে তিনি ২৫০ বই লেখেন—এ সবের মধ্যে "রবিনসন ক্রুসো" হল বিশ্ববিখ্যাত। ডিফোই ইংরাজী ভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর উপন্যাস, বাস্তবধর্মী।

পুঁজিবাদী সভ্যতার দোষগুণ সবই সমভাবে ডিফোতে বর্তেছিল। তিনি সাধুপুরুষ ছিলেন না, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে সাধুতার কোন স্থান নেই এ বিষয়ে তিনি বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন। আর রাজনীতি থেকে অর্থনীতি সব ব্যাপারেই তাঁর সমান উৎসাহ ছিল। এর ফলে একবার তাঁকে কারাবাসও করতে হয়েছিল।

তাঁর নিজের জীবন ও তাঁর পরিপার্শ্বের সমস্ত মানুষের জীবনকে তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য ও অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর লেখায় এই জীবনের বাস্তবরূপ সহজ ও সরল ভাষায় তিনি ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মূলে আছে তাঁর এই কৃতিত্ব।

ডিফোর বয়স যখন প্রায় ৬০ তখন "রবিনসন ক্রুসো" প্রকাশিত হয়। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে আলেকজান্ডার সেলকার্কের একটি নির্জন দ্বীপে বার মাস অতিবাহিত করার কাহিনীই ডিফোকে "রবিনসন ক্রুসো" রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। নিছক একটি কাহিনীকে সত্য ঘটনা বলে প্রতিভাত করাই হল ডিফোর অসাধারণ কৃতিত্ব; সাহিত্য জগতে "রবিনসন ক্রুসো"র গুরুত্ব প্রধানতঃ এরই মধ্যে নিহিত। "পড়ার সময় একজন সত্যিকারের লোক গল্পটা বলছে না একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব···"—ডিফোর গল্পগুলি সম্পর্কে চার্লস ল্যাম্বের এই মন্তব্য সবাই মানতে বাধ্য।

ক্রুসোর চরিত্র বহু পরিমাণে ডিফোরই চরিত্র। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর জন্য দেশ-দেশান্তরে দুঃসাহসিক অভিযান, তৎকালীন ইয়োরোপীয় সভ্যতার তুলনায় পশ্চাৎপদ ভারত-চীন প্রভৃতি প্রাচীন দেশগুলির মানুষদের অবজ্ঞার চোখে দেখা, বিভিন্ন দেশের মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর মুনাফা করা এবং এমনকি উপনিবেশ স্থাপন করা—ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদয়-কালের এইসব বৈশিষ্ট্য রবিনসন ক্রুসোর মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান। বনিক ডিফো তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই উদীয়মান ধনিক সমাজের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

রবিনসন ক্রুসোর মূল কাহিনীকে এমনভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় পরিবেশন করা হয় যে, ছোটরা (এবং বড়রাও) গল্পের নেশায় মেতে ওঠে, ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদয়ের চিত্র হিসাবে এই কাহিনীকে দেখবার কথা মনেই হয় না।

কাহিনীর নায়ক রবিনসন ক্রুসো (ক্রয়েটংসার) ১৬৩২ খৃঃ অব্দে ইংল্যাণ্ডের ইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন জার্মান, মা ইংরেজ। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী।

১৬৫১ সালে ক্রুসো প্রথম সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে হালে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে এক বন্ধুর সঙ্গে লণ্ডন যাত্রা করেন। পথে ঝড় ওঠে এবং উপকূলের কাছে জাহাজ ডুবে যায়। কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ইয়ারমাউথে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকে লণ্ডন চলে যান। প্রথম অভিযানেই রবিনসন ক্রুসো বেশ পোক্ত হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় অভিযানকালে রবিনসন একেবারে সুদূর আফ্রিকার গিনিতে হাজির হলেন এবং চুটিয়ে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থার্জন করলেন। এরপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

এবার নিজেই উদ্যোগী হয়ে আগের সেই জাহাজেই পাড়ি দিলেন সমুদ্র-পথে। পথে পড়লেন তুরকী বোম্বেটেদের হাতে। তুরকীদের চোখে ধুলো দিয়ে নৌকায় পালিয়ে গেলেন ক্রুসো। সমুদ্রে একটি পর্তুগীজ জাহাজে তিনি আশ্রয় পেলেন। জাহাজ চলেছে ব্রাজিলের দিকে। সে সময় ব্রাজিলে পর্তুগীজদের ফলাও কারবার চলেছে। জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ক্রুসো ব্রাজিলে আখের বাগিচার জন্য জমি কিনলেন। উদ্দেশ্য চিনির কারবার করা। চিনির কারবার বেশ জমে উঠল।

চার বছর ব্রাজিলে বাস করার পর অন্যান্য বণিকদের উৎসাহে তিনি আবার পাড়ি দিলেন আফ্রিকায়। ক্রুসোর নিজের উৎসাহ ও আগ্রহও কম ছিল না। ব্রাজিলে পর্তুগীজ ভাষা শিখে পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন রবিনসন ক্রুসো। কি করে আফ্রিকার সরল ও অজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে সামান্য পুঁথি, খেলনা, ছুরি, কাঁচি, কুড়ুল, কাঁচের জিনিস ইত্যাদির বিনিময়ে সোনা, হাতির দাঁত বাগানো যায়। এমনকি নিগ্রো দাসও কেনা যায় ক্রুসো সে সব কথা পর্তুগীজ বণিকদের সবিস্তারে বলেছিলেন। আখের বাগিচাগুলির জন্য লোকের খুব দরকার,

কাজেই পর্তুগীজ বণিকরা নিগ্রো ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য ক্ষেপে উঠল। ক্রুসোকে তারা বিনা খরচায় নিগ্রো ক্রীতদাস সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের উপদেষ্টা রূপে তাদের সঙ্গে নিল। ৬টি কামান সজ্জিত জাহাজে মালপত্র ও লোকজন নিয়ে তারা পাড়ি দিল আফ্রিকার দিকে। পথে প্রচণ্ড ঝড়ে জাহাজডুবি, কে কোথায় ভেসে গেল ঠিক নেই, শুধু ক্রুসো কোনক্রমে বেঁচে গিয়ে এক নির্জন দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ২৮ বছর ২ মাস ২৯ দিন (প্রধানতঃ এই দ্বীপে বাস করার সময়কার কাহিনীই রবিনসন ক্রুসোর কাহিনীরূপে ছোটদের কাছে পরিচিত) এই দ্বীপে কাটিয়ে ক্রুসো ১৬৮৬ সালে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন। ১৬৮৭ সালের ১১ জুন ইংল্যাণ্ডে উপনীত হওয়ার পর তিনি পর্তুগালে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর সেই ক্যাপটেন বন্ধুর কাছে গচ্ছিত প্রচুর অর্থ পেয়ে ক্রুসো আবার বিত্তশালী হলেন।

পর্তুগাল থেকে স্পেন ও ফ্রান্স হয়ে ক্রুসো জলপথে দেশে ফিরে সংসার পাতলেন। সুখের সংসার, সন্তানাদি পরিবৃত ক্রুসো শান্তিতে ১১ বছর কাটালেন দেশে। কিন্তু দুনিয়াকে দেখার ও ব্যবসা বাণিজ্যের নেশা তখনও কাটে নি। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ১৬২৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিজের (আজকের ইন্দোনেশিয়া) দিকে পাড়ি দিলেন। পথে নিজের স্থাপিত উপনিবেশ পরিদর্শন করতেও ভুললেন না। (উপনিবেশটি ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ছিল বলেই মনে হয়।) এরপর ব্রাজিল হয়ে ক্রুসো পৌঁছুলেন ভারতে। ভারতীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, ক্রুসোর দলবলের হাতে বহু ভারতীয় হতাহত হয়। এর মধ্যে কারবারও চলতে থাকে। ভারত থেকে চীনে। চীনে বেশ ফলাও কারবার হয়, তবে সেখানেও বিরোধ বাধে এবং সংঘর্ষে বহু চীনাকে ঘায়েল করে ক্রুসো আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। ইস্ট ইণ্ডিজেও কারবার ভালই হয়। শেষ পর্যন্ত চীন-রাশিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে রবিনসন ক্রুসো দেশে ফেরেন।

ডানিয়েল ডিফো রচিত রবিনসন ক্রুসোর সমগ্র কাহিনী ইয়োরোপে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর ছবি যথাযথভাবে আঁকা হয়েছে। ইতিহাস পড়ে ইয়োরোপীয় বণিকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানতে পারি তার সব কিছুই রবিনসন ক্রুসোর কাহিনীতে বিধৃত। আর এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে তৎকালীন আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ও নানা দিক থেকে অগ্রসর ইয়োরোপীয় বণিকদের দম্ভ, অনগ্রসর ভারতীয়,

চীনা ও আরবাসিত রুশদের প্রতি অবজ্ঞা এবং অপরিসীম আত্মবিশ্বাস রবিনসন ক্রুসোর মধ্যে বেশ উৎকটভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাপারে ডিফো কোনরকম দ্বিধাবোধ করেন নি।

ইংল্যাণ্ডের ধনিকশ্রেণী বিত্তশালী হয়ে উঠছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটছে, বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছে—এ সব দেখেই ডিফো আত্মহারা হয়েছিলেন। রবিনসন ক্রুসোর কাহিনীতে হাসিকান্নার কোন স্থান নেই, দয়া মায়া করুণা—এক কথায় হৃদয়াবেগের কোন আভাষমাত্রও সেখানে পাওয়া যায় না। অথচ ঈশ্বরভক্তিতে ক্রুসো গদগদ! ভিন্ন দেশের মানুষ অনুগত হলে, আত্মসমর্পণ করলে তাকে পবিত্র খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে সভ্য করে তুলতে তাঁর আগ্রহের অভাব নেই। ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদয়কালে ইয়োরোপীয় বণিকদের এই চেহারা আমাদের কাছে সুপরিচিত।

ড্যানিয়েল ডিফো তাঁর "রবিনসন ক্রুসো" ছাড়াও তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ "ব্রিটেন সফর"-এ (এ টুর থ্রু গ্রেট ব্রিটেন—১৭২৪) সোৎসাহে ও সোল্লাসে ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদয়পর্ব বর্ণনা করেছেন। ব্রিটেন সফরের সময় তাঁর চোখে পড়েছে অগণিত কুটীর যেসব কুটীরের মধ্যে কাপড় তৈরীর কাজে নিযুক্ত রয়েছে নারী ও শিশুর দল। কেউ বসে নেই, চার বছর পার হয়েছে কিনা সন্দেহ এমন শিশুও রোজগার করে। আর মহৎ পণ্য প্রস্তুতকারক বা মালিকদের (নোবল ম্যানুফ্যাকচারার) মতই কাপড়ের কারবারে ফড়েদের দয়ায় এত লোকের অন্ন সংস্থান হচ্ছে দেখে ডিফো পুলকিত। এই ফড়েরা কম ধনী নয়, স্বয়ং রাজা জেমস কাপড়ের কারবারের নামকরা ফড়ে এবং পরে কাপড়ের কারখানার মালিক নিউবেরির জ্যাকের ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে বলেছিলেন ও তো তাঁর চাইতেও ধনী। এ গল্প বেশ সদম্ভে প্রচার করেছেন ড্যানিয়েল ডিফো।

ডিফো বস্তুবাদী, নির্মম বাস্তববাদী। তাঁর"রবিনসন ক্রুসো" মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদয় কালের এক হৃদয়হীন বাস্তব ছবি।

র‍্যালফ ফক্স্-এর মতে "রবিনসন অতীতকে পরিহার করেছে, তার ইতিহাস রচনা করতে সে প্রস্তুত হয়েছে। সে এক নতুন মানুষ যে তার শত্রু প্রকৃতির উপর হুকুম জারি করার জন্য তৈরী। রবিনসনের জগৎ বাস্তব জগৎ..." (নভেল এ্যাণ্ড দ্য পিপল, পৃঃ ৫৮, মস্কো সং, ১৯৫৮)

অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে

এল. আই. ব্রেজনেভ

[অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এল. আই. ব্রেজনেভের প্রতিবেদন থেকে গৃহীত।]

কমরেডগণ, পৃথিবীর ইতিহাসে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের মত এমন সুগভীর ও স্থায়ী প্রভাব মনুষ্য জাতির উপর আর কোন বিপ্লব ফেলে নি। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অক্টোবরের বিদ্যুচ্ছটা বহু দেশের জাতির পক্ষে ভবিষ্যৎ অভিমুখী পথকে আলোকিত করেছিল। ইতিহাস আক্ষরিক অর্থেই বিরাট পদক্ষেপে এগুতে শুরু করেছিল।

যে-অক্টোবর বিপ্লব এ যুগের চেহারাকে আকার দিয়েছে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিণাম হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ও বিকাশ। এক সময় অক্টোবর বিপ্লবের জয় ও লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের উপর এর প্রচণ্ড প্রভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বুর্জোয়ারা পৃথিবীর প্রতিটি বৈপ্লবিক ঘটনার মধ্যে 'মস্কোর হাত' আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিল। আজকাল প্রায় কোন লোকই এরূপ রূপকথা বিশ্বাস করে না। বিপ্লব শুরু হয় ও জয়যুক্ত হয় প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা-বিকাশ ও তার জনগণের ইচ্ছার কারণে। ইওরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার পর পর অনেকগুলি জয়যুক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অক্টোবর বিপ্লবের চিন্তাধারা ও আদর্শের ধারাবাহিকতার দ্যোতক।

ফলে, বিশ্ব সমাজতন্ত্রের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। যে দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করেছে তাদের প্রতিটি কোনো কোনো দিক

শিল্পের বিকাশ, কৃষকদের সমবায়ে টেনে আনা ও জনগণের ভাবাদর্শগত পুনঃ-শিক্ষার সমস্যাগুলির মোকাবিলা করেছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বিকাশের ও জাতীয় ঐতিহ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্তরবিশিষ্ট অন্যান্য জাতি ও দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কর্মের সুনির্দিষ্ট রূপগুলিকে আরও অধিকতর বৈচিত্র্য দান করবে। এটা খুব স্বাভাবিক।

কিন্তু জীবন এও প্রমাণ করে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের সাধারণ মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য লক্ষণগুলি সর্বত্রই বলবৎ ও প্রযোজ্য থাকছে। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বিকাশের অভিজ্ঞতার মোট ফল নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রত্যয় উৎপাদক সাক্ষ্য বহন করছে :

বিপ্লবে ক্ষমতা এখনো প্রধান প্রশ্ন। হয় এ অস্ত্র সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা, নয়তো বুর্জোয়াদের ক্ষমতা। তৃতীয় কোন সম্ভাবনা নেই।

সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব একমাত্র যদি শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্ররা প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করার পর একে পুঁজিপতি ও অন্যান্য শোষকদের প্রভুত্বের অবসান ঘটাবার জন্য ব্যবহার করে।

সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হতে পারে একমাত্র যদি শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্র-বাহিনী কমিউনিস্টরা এক নতুন সমাজ নির্মাণের সংগ্রামকে শ্রমজীবী জনগণকে অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়, এবং সমাজতান্ত্রিক ধারায় অর্থব্যবস্থা ও সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তর ঘটায়।

সমাজতন্ত্র তার প্রতিষ্ঠাভূমি সুসংহত করতে পারে একমাত্র যদি শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতা শ্রেণীশত্রুর যে কোন আক্রমণের (এবং এরূপ আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী, অভ্যন্তর থেকে ও খুব সম্ভব বাইরে থেকেও) বিরুদ্ধে বিপ্লবকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

এগুলি আজকের সমাজতন্ত্রের বিকাশের কয়েকটি শিক্ষামাত্র। আমাদের বিপ্লবের সমস্ত সুনির্দিষ্ট অবস্থা থাকা সত্ত্বেও এগুলি আরও একবার অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতার বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সপ্রমাণ করছে। এগুলি আরও একবার সপ্রমাণ করছে লেনিনের এই কথাগুলির বিরাট সত্যকে : 'রুশ মডেলই সমস্ত দেশের কাছে তাদের নিকট ও অনিবার্য ভবিষ্যতের

কিছুটা—এবং অতি তাৎপর্যমণ্ডিত কিছুটা—প্রকাশ করছে।' (ভি. আই. লেনিন, রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ৩১, পৃঃ ২২)।

কিন্তু বিশ্ব সমাজতন্ত্রের এক ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এ প্রমাণ করছে যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথ থেকে বিচ্যুতি, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে বিচ্যুতি অনিবার্যভাবেই জনগণের সামরিক পরাজয় ঘটায় ও তাদের বিরাট অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে।

একথা সুবিদিত যে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মগুলি অস্বীকার করার চেষ্টা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সংহতি থেকে বিচ্যুতি এবং বিশ্ব মঞ্চে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির সঙ্গে মিতালি চীনে গুরুতর পরিণাম ডেকে এনেছে। চীনা জনগণের সমাজতান্ত্রিক সাফল্যসমূহ গুরুতররূপে বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কিছু কিছু নেতা এখন স্পষ্টতই ভরসা করছে চীনা লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বর্তমান বিরোধ ও বিচ্ছেদের উপর যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। তারা ভরসা করছে ভবিষ্যতে এ এমনকি আরও তীব্র হয়ে উঠবে। আমরা মনে করি এ এক অদূরদর্শী কর্মনীতি। যারা এ অনুসরণ করছে তাদের ঠিকে ভুল হতে পারে।

ভবিষ্যতে সোভিয়েত-চীনা সম্পর্ক কোন রূপ নেবে তা নিয়ে অনুমান করার অর্থ হয় না। আমি শুধু বলতে চাই এই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য আমরা পুনঃপুনঃ যে প্রস্তাব করেছি তা বজায় রয়েছে।

কমরেডগণ, ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্মনীতির দরুন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে, সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমবায়ের দেশগুলির মধ্যে যে-নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সমকালীন বিশ্বের জীবনে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক বিরাট অবদান।

আমরা পরিচ্ছন্ন বিবেক নিয়ে বলতে পারি: আমাদের মৈত্রী, আমাদের বন্ধুত্ব, আমাদের সহযোগিতা অভিন্ন উদ্দেশ্য ও স্বার্থের দ্বারা, কমরেডসুলভ সংহতি ও পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক-বন্ধনের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ সার্বভৌম ও সমানাধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মৈত্রী, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা। আমরা একসঙ্গে এগিয়ে চলেছি, একে অপরকে সাহায্য করছি এবং যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে যাবার জন্য আমাদের চেষ্টা, জ্ঞান ও সম্পদ একত্রিত করছি।

যুক্তভাবে কাঁচামাল, জ্বালানি ও শক্তি, খাদ্য ও পরিবহণের সমস্যাদির সমাধানের কর্মধারা নিয়েছি। সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতির ভিত্তিতে আমরা, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, বিশেষীকরণ ও সহযোগিতা গভীর করে আনছি। আমরা নির্ভরযোগ্যভাবে, ব্যয় সাশ্রয় করে ও দীর্ঘ-মেয়াদী ভিত্তিতে এইসব সমস্যার সমাধান করতে চাই। প্রতিটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের ও সমগ্রভাবে রাষ্ট্র-সমবায়ের স্বার্থ ও প্রয়োজন যথাসাধ্য বিবেচনায় রেখে এই সমস্যাগুলির আমরা সমাধান করতে চাই।

কমরেডগণ, ১৯১৭ সনের অক্টোবরের সেই দূরের দিনগুলিতে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকগণ একা লড়াইয়ে এগিয়ে এসেছিলেন পুরনো দুনিয়ার বিরুদ্ধে, লোভ, পীড়ন ও হিংসার দুনিয়ার বিরুদ্ধে। তাঁরা বৈরী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-গুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। সাফল্যের সঙ্গে তাঁরা সমাজতন্ত্র গড়েছিলেন ও একে বিকশিত করেছিলেন। আজকে আমরা একা নই। আমাদের দেশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এক বিরাট পরিবারের অংশ হয়ে উঠেছে। আমাদের চারপাশে দুনিয়ায় এই সমাজ-তান্ত্রিক পরিবারের বেশি কিছু কি আমরা, সোভিয়েত কমিউনিস্টরা ও অন্যান্য সোভিয়েত জনগণ, কামনা করতে পারি? এর সমৃদ্ধির জন্য, আমাদের অভিন্ন কল্যাণের জন্য আমরা সাধ্যমত সব কিছু করে এসেছি।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উপর আমাদের অক্টোবর বিপ্লব যে বিপুল প্রভাব ফেলেছিল তার গুরুত্ব অপরিসীম।

অক্টোবর বিপ্লবের জন্যই উপনিবেশের জাতিগুলির রাজনৈতিক চেতনা সত্যি জাগ্রত করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে বিরাট সাফল্য অর্জনে তাদের সাহায্য করেছিল। সেই ১৯১৯ সনে লেনিন লিখেছিলেন যে 'প্রাচ্যের জাতিগুলির মুক্তি এখন খুবই বাস্তবসাধ্য।' (ভি. আই. লেনিন, রচনা সংগ্রহ, (খণ্ড ৩০, পৃঃ ১৫৩-৫৪)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ের পর থেকে ২০০ কোটির বেশি মানুষ উপনিবেশবাদীদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন এবং স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তায় উন্নীত হয়েছেন। ক্লাসিক্যাল রূপে সাম্রাজ্য-বাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা মোটের উপর ভেঙ্গে পড়েছে বলে মনে করা যায়। কমরেডগণ, এ এক যুগান্তকারী ঘটনা।

অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মুক্তি অর্জনকারী দেশগুলির অনেক কটিই

বিকাশের পুঁজিবাদী পথ প্রত্যাখ্যান করছে এবং শোষণমুক্ত এক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্য গ্রহণ করেছে, এবং সমাজতন্ত্র অভিমুখী পথ গ্রহণ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এইসব দেশের অটল ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু, এবং প্রগতিশীল পথ ধরে তাদের বিকাশের সর্বাধিক পরিমাণে সাহায্য ও সমর্থন-দানে প্রস্তুত। এর অর্থ শুধুমাত্র নৈতিক ও রাজনৈতিক নয়, পরন্তু অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক সমর্থন, যার মধ্যে পড়ে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধির ব্যাপারে সাহায্য।

মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে কোন সহজ পথ নেই। সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বসাধারণের আর্থব্যবস্থার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠাকল্পে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শোষক অংশগুলির ও তাদের বিদেশী পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর লড়াই অনিবার্য। প্রায়ই এর ফলে নবীন রাষ্ট্রগুলির কর্মনীতিতে আঁকাবাঁকা গতি দেখা যায় এবং কখনো কখনো এমনকি পশ্চাদপসরণও ঘটে। কিন্তু ঘটনা-বিকাশের সার্বিক প্রবণতা সংশয়াতীত। যে শ্রমজীবী জনগণ জীবনে তাঁদের স্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন তাঁদের ইচ্ছাশক্তি এই স্থির গ্যারান্টি যোগাচ্ছে যে জাতীয় স্বাধীনতা শক্তিশালী হবে এবং শোষণ ও পীড়নমুক্ত সমাজব্যবস্থা শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হবে।

অবশ্য এর কোনটির অর্থ এই নয় যে সাম্রাজ্যবাদ ঘটনাবিকাশের এরকম একটা গতিধারার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। না, নেয় নি; বস্তুত, পূর্বেকার উপনিবেশগুলিতে তার প্রতিষ্ঠা এখনও অনেক ক্ষেত্রেই বেশ সুদৃঢ়, আর সাম্রাজ্যবাদীরা সেটা বজায় রাখার চেষ্টায় সবকিছুই করছে এবং যেখানেই সম্ভব তা গভীরতর করার ও তার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করছে।

যে সমস্ত দেশ নিজেদের মুক্ত করেছে তাদের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাদের কাছে আর একটা মামুলী ব্যাপার নয়। এই ধরনের অধুনাতম বড় রকমের ক্রিয়াকলাপটি হল—ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ—যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এমন এক শোচনীয় ও অবমাননাকর পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে যেটা এই ধরনের জুয়াখেলার পুনরাবৃত্তি ঘটানোতে উৎসাহ যোগানোর সহায়ক নয়।

নবীন রাষ্ট্রগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়ছে, এবং জোট-নিরপেক্ষতার আন্দোলনই হল তার একটা প্রমাণ।

সাম্রাজ্যবাদ পূর্বেকার উপনিবেশগুলিতে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে বা নানাভাবে তাদের বশীভূত করেছে সেগুলিও যে তাদের সহায়ক হবে, এটাও অনুরূপভাবেই সন্দেহজনক। যাই বলা হোক না কেন, এই সরকারগুলি তাদের জনগণকে সেই একই পুরনো সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরতার নতুন ধরন ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না।

প্রাচ্যের দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তির জন্য জনসাধারণের সংগ্রামের প্রথম ঢেউগুলি যখন উত্তাল হয়ে উঠছিল, লেনিন তখন লিখেছিলেন, '...এশিয়ার পুরনো ভূমিদাসপ্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে কিংবা এশিয়া ও এশিয়ার অনুরূপ দেশগুলির জনগণের বীরত্বমণ্ডিত গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করে, পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই।' (ভি. আই. লেনিন, রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ১৮, পৃঃ ৫৮৪)। আজ আমরা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি: সাম্রাজ্যবাদের পূর্বতন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির কোটি কোটি মানুষের বীরত্বপূর্ণ মুক্তি সংগ্রামের ফলাফলকে মুছে ফেলতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই। জনগণের মুক্তির আদর্শ অপ্রতিরোধ্য, ভবিষ্যৎ তারই। অক্টোবর বিপ্লব প্রজ্বালিত আলোকশিখা বিশ্ব ইতিহাসের এই রণাঙ্গনেও ব্যর্থ হবে না।

কমরেডগণ, অক্টোবর বিপ্লবের জয় আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সংগ্রামে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে, এবং তারপর অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের ঘটনা পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক পরিপক্কতা বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। তার বাহিনী আরো সংগঠিত হয়েছে। ইতিহাসে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করাই যার ভবিতব্য এমন এক শক্তির উদ্ভব ঘটল—সে শক্তি হল, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন। একচেটিয়া ব্যবস্থার আধিপত্যের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের মিত্রদের মোর্চা আরো ব্যাপক হয়ে উঠল।

এর মধ্যে, পুঁজিবাদ যে এক ভবিষ্যৎহীন সমাজব্যবস্থা তার পরিচয় সে ক্রমেই বেশি সুস্পষ্টভাবে দিয়ে চলেছে। তার অর্থব্যবস্থা দুরারোগ্য জরাক্রান্ত। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি শ্রমিক সাধারণকে এত ব্যাপক আকারে কারখানা থেকে বার করে দিচ্ছে যে তা গোটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নড়িয়ে দেবে এমন আশঙ্কা রয়েছে। দর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, আর মুদ্রাস্ফীতি এখনও মূল সমস্যা হয়ে রয়েছে। অপ্রীতিকর রাজনৈতিক কায়দা-

কৌশল সম্পর্কে মর্মান্তিক সত্য উদ্ঘাটন সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও নির্লজ্জভাবে আইন লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি বোমার মত প্রথমে এক দেশে, পরে অন্য দেশে ফেটে পড়ছে, এবং সেগুলি শাসকশ্রেণীর অধঃপতনের প্রমাণ দিচ্ছে। রেকর্ডসংখ্যক অপরাধের হার চিত্রটি সম্পূর্ণ করে তুলছে। এই সবকিছু থেকে এটাই বোঝায় যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়গত সামাজিক-রাজনৈতিক পূর্বশর্তগুলি উচ্চমাত্রায় পরিণত হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য জনসাধারণের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অবশ্য, বুর্জোয়াশ্রেণী হল এক অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষ। তারা তাদের রণকৌশল, এবং কায়দা-কৌশল বদলায়। নিজেদের অবস্থা সুদৃঢ় করার এবং সমাজতন্ত্র অভিমুখে জনগণের আকৃষ্ট হওয়ার ধার ভোঁতা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা আংশিক সংস্কারের আশ্রয় নিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলকে ত্রুটিহীন করে তোলার চেষ্টা করছে। একচেটিয়া সংস্থাগুলির আধিপত্যের বিরুদ্ধে তারা সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করার প্রয়াস করছে। এই প্রসঙ্গে তাদের তত্ত্বগত পথনির্দেশে চিন্তাকর্ষক সমস্ত বিষয় থাকছে, যদিও হয়ত তার সবকিছুই চূড়ান্ত ও তর্কাতীত বলে গণ্য করা যায় না। এটা বোধগম্য : অনুসন্ধান হল অনুসন্ধানই। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল সেটা চালাতে হবে সঠিক দিকে।

পথ যেটাই বেছে নেওয়া হোক না কেন, কমিউনিস্টদের চূড়ান্ত কাজটি হল জনসাধারণকে প্রধান লক্ষ্য অভিমুখে, সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালনা করা। অক্টোবর বিপ্লবের জয়ের জন্য সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে বিপ্লবী কাজকর্মে রণকৌশল বদল করা, নতুন নতুন মিত্র অর্জনের উদ্দেশ্যে আপস করা সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব। কিন্তু আমরা আরো একটি ব্যাপারে স্থির-নিশ্চিত হয়েছি : কোনও পরিস্থিতিতেই রণকৌশলগত সুবিধার স্বার্থে মূলনীতিসমূহ বিসর্জন দেওয়া যায় না। এ না হলে, কথায় যা বলে, চুল হয়ত বাঁচবে, কিন্তু মাথাটি খোয়াতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রভাব যত বাড়বে, সাম্রাজ্যবাদ ততই তীব্রভাবে কমিউনিস্টদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করবে। এটা করা হয় স্থূলভাবে চাপ ও হুমকীর সাহায্যে—এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মভাবেও। সময়

সময় বুর্জোয়া দেশগুলিতে কমিউনিস্টদের এখন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে যে 'সমাজে তাদের একটা স্থান পাওয়ার অধিকার' 'স্বীকৃতি' হবে। এর বিনিময়ে অতি 'সামান্য' একটা দাবি জানানো হচ্ছে: সেটা হল, তারা যেন পুঁজির ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করে এবং আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংহতি পরিহার করে। কিন্তু কমিউনিস্টরা দীর্ঘদিন আগেই নিজেদের জন্য একটা স্থান অধিকার করেছে। সেটা তারা অধিকার করেছে। তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের সাহায্যেই। সমাজে তাদের ভূমিকা জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত, আর কেউই তা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে পারবে না।

কমিউনিস্টদের বাহিনীর সংহতি ক্ষুণ্ণ হোক, সাম্রাজ্যবাদীদের সেটা খুবই কাম্য হবে। সেই জন্যই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই অসত্য প্রচার অনবরত করে যাওয়া হচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি—সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনকল্পে নিজেদের ব্যবস্থাপত্র পশ্চিমের কমিউনিস্টদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু স্পষ্টতই এটা বানানো কথা।

অন্য সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির মতই আমাদের পার্টি কমিউনিস্ট আন্দোলনে সাধারণভাবে স্বীকৃত নীতিগুলি দৃঢ়ভাবে মেনে চলছে: সেগুলি হল, সমানাধিকার, স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যে সংহতি ও পারস্পরিক সমর্থন।

আজ আমরা যখন আমাদের বিপ্লবের ৬০ তম বার্ষিকী উদযাপন করছি, আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্টরা তখন পুনর্বার ঘোষণা করছি যে আমরা বিশ্বের কমিউনিস্টদের মহান ভ্রাতৃত্ববন্ধনের প্রতি সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকব। পুঁজির একনায়কত্বের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা, শান্তি ও সমাজ প্রগতির জন্য সংগ্রামরত কমিউনিস্ট ও শ্রমিকদের পার্টিসমূহ এবং তাদের মিত্ররা সর্বতোভাবে সফল হোন, এই কামনাই আমরা করছি। আপনারা সব সময়েই আমাদের বন্ধুত্ব, সংহতি ও সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পারেন।

কমরেডগণ, লেনিনের শান্তির ডিক্রির স্বাক্ষর নিয়ে সোভিয়েত সরকার জন্মগ্রহণ করেছে, আর সেই সময় থেকেই আমাদের দেশের পররাষ্ট্রনীতি হল শান্তির নীতি। বিশ্বগত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিই তার সুনির্দিষ্ট

বিষয়বস্তু নির্দেশ করেছে : তা হল, ভিন্ন সমাজব্যবস্থা বিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

আমাদের কালে একমাত্র বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত নীতি হিসেবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলি আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহে বেশ দৃঢ়মূল হয়েছে। এটা হল বিশ্বে শক্তিসমূহের পরিবর্তিত পারস্পরিক সম্পর্কেরই ফল—সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমগ্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমবায়ের বর্ধিত পরাক্রম ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ফল। এটা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তির শক্তিসমূহের সাফল্যেরও ফল। আর সর্বশেষে, এটা পুঁজিবাদী দুনিয়ার শাসকমহলগুলির একটা সুনির্দিষ্ট অংশের নতুন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ারও ফল।

সঙ্গে সঙ্গে, এটা হল সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমবায়ের অন্যান্য দেশগুলির শান্তির অভিমুখে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বিপুল কর্মপ্রয়াসের ফল।

বিশ্বের নিরাপত্তাবর্ধক পরিবর্তনগুলি ১৯৭০-এর দশকে বিশেষভাবে উপলব্ধিযোগ্য হয়েছে এবং সেই সব পরিবর্তনকেই বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহজ-সম্পর্কের প্রক্রিয়া। এই পরিবর্তনগুলি সুনির্দিষ্ট এবং উপলব্ধিযোগ্য। সেগুলি হল, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৎ ও ন্যায্য সম্পর্কের এক ধরনের নিয়মবিধি স্বীকার করে নেওয়া এবং সেগুলি আন্তর্জাতিক দলিলগুলিতে বিধিবদ্ধ করা, যা সামরিক জুয়াখেলায় মত্ত সকলের কাছে একটা আইনী ও নৈতিক-রাজনৈতিক বাধার প্রাচীর তুলে দিচ্ছে। সেগুলি হল, অস্ত্র প্রতিযোগিতার কয়েকটি পথ বন্ধ করা সম্পর্কে প্রথম পারস্পরিক বোঝাপড়া—এখনকার জন্য তা সামান্য হলেও—অর্জন করা। সেগুলি হল, ভিন্ন সমাজব্যবস্থাবিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বহুবিধ ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করে সম্পাদিত বহুশাখায়িত চুক্তির জাল।

ভালর দিকে এইসব পরিবর্তন সবচেয়ে স্পষ্ট হল ইওরোপে, যেখানে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক, পারস্পরিক উপলব্ধি এবং জাতিসমূহের পারস্পরিক স্বার্থ এবং তাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ছে। এই সাফল্যগুলিকে আমরা অত্যন্ত মূল্য দেই, এবং একে সর্বতোভাবে রক্ষা ও সংহত করা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। সুতরাং, ফ্রান্স, ফেডারেল জার্মানি, ব্রিটেন ও ইতালির মত দেশগুলির সঙ্গে—ভিন্ন সমাজব্যবস্থাবিশিষ্ট

ইওরোপের ছোট-বড় সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতি আমরা বিপুল গুরুত্ব আরোপ করি।

এটাও স্বাভাবিক যে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিও বিপুল গুরুত্ব আরোপ করি। আমাদের দুই দেশকে তফাৎ করছে এমন অনেক কিছুই আছে-সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ভাবাদর্শ পর্যন্ত অনেক অনেক তফাৎই আছে। আমরা যেভাবে চাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকলেই তা পছন্দ করেন না, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা চলছে সে সম্পর্কে আমরাও অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু পার্থক্য যদি তীব্র করে তোলা হয়, যদি পরস্পরকে উপদেশ বিতরণের চেষ্টা করা হয়, তার ফল হবে এই যে কেবল অবিশ্বাস ও শত্রুতাই বাড়বে, সেটা আমাদের দুই দেশের কাছেই হবে অর্থহীন এবং সমগ্রভাবে বিশ্বের পক্ষে হবে বিপজ্জনক। সোভিয়েত রাষ্ট্রের একেবারে সূচনাতেই লেনিন আমেরিকান নেতাদের কাছে, এটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে 'তাদের পছন্দ হোক বা না-হোক, সোভিয়েত রাশিয়া হল এক বৃহৎ শক্তি' এবং 'আমাদের সরকার তাদের কাছে অপ্রীতিকর এই যুক্তিতে আমাদের সঙ্গে কারবার চালাতে অস্বীকৃত হওয়ার উইলসনীয় কর্মনীতিতে আমেরিকার কোন লাভই হবে না।' (লেনিনের বিবিধ রচনা, খণ্ড ৩৭, পৃঃ ২৫৪, রুশ ভাষায়)। অর্ধ শতক আগে একথা সত্য ছিল। আজ তা আরো বেশি সত্য।

শান্তির জন্য উদ্বেগবোধ থেকে সৃষ্ট এক দীর্ঘমেয়াদী চরিত্রসম্পন্ন বিচার-বিবেচনাই সোভিয়েত-আমেরিকান সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিয়ামক হবে, এটাই হল জীবনের অভিজ্ঞতার চাহিদা। এই পথই আমরা অনুসরণ করছি এবং বিনিময়ে এটাই আমরা আশা করি। সমানাধিকার ও পারস্পরিক মর্যাদার ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের বিকাশ ঘটিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে ইচ্ছার কোনও অভাব নেই।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখন এক সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে, যার পরিণতি হতে পারে হয় বিশ্বাস ও সহযোগিতার বৃদ্ধি, হয়তো পারস্পরিক ভয়, সন্দেহ ও অস্ত্রমজুত। এই সন্ধিক্ষণের পরিণতি শেষ পর্যন্ত হতে পারে হয় স্থায়ী শান্তি নয়তো খুব বেশি হলে যুদ্ধের কিনারায় ভারসাম্য রাখা। সহজ-সম্পর্ক শান্তির পথ বেছে নেবার সুযোগ যোগাচ্ছে। এ সুযোগ হারানোটা হবে পাপ। এখন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে জরুরী কাজ হল পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত অস্ত্র-প্রতিযোগিতা থামান।

পরিতাপের বিষয়, অস্ত্রমজুত গড়ে তোলার কাজ চলছে এবং তা ক্রমেই অধিকতর বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে। গণ-বিধ্বংসী নতুন নতুন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার করা হচ্ছে, আর কাদের উদ্যোগে এটা হচ্ছে তা সুবিদিত। কিন্তু প্রতিটি নতুন ধরনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, তথা সামরিক-কারিগরি বা রণনৈতিক পরিণামের বিচারে কতিপয় অজ্ঞাত উপাদান রয়েছে। স্পষ্টতই একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখবার মূর্খোচিত আশায় এক ধরনের অস্ত্র থেকে আর এক ধরনের অস্ত্র আবিষ্কারের ছুটোছুটি শুধু অস্ত্র প্রতিযোগিতাই বাড়াতে পারে, পারস্পরিক অবিশ্বাস গভীর করতে পারে এবং নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থাদি বিঘ্নিত করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমি পুনরায় সবচেয়ে জোর দিয়ে একটা কথা বলতে চাই যা আগেও বলেছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যকরীভাবে তার প্রতিরক্ষা সামর্থ্যকে লালন করছে, কিন্তু সে অপর পক্ষের উপর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব চায় না, চাইবে না। আমরা মধ্য ইওরোপে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে বিদ্যমান মোটামুটি সামরিক ভারসাম্য উল্টে দিতে চাই না। কিন্তু বিনিময়ে আমরা দাবি করি অন্য কেউ তার অনুকূলে এই ভারসাম্য উল্টে দিতে চাইবে না।

বলা নিষ্প্রয়োজন, বিদ্যমান ভারসাম্য বজায় রাখাটাই শেষ লক্ষ্য নয়। আমরা অস্ত্র-প্রতিযোগিতার নিম্নমুখী গতি শুরু করার এবং ক্রমশ সামরিক মুখোমুখি সংঘাতের অবস্থার স্তর নামিয়ে আনার পক্ষপাতী। আমরা মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বিপদ পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদাশঙ্কা যথেষ্ট কমাতে ও তারপর দূর করে দিতে চাই। এটাই হল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সুবিদিত প্রস্তাবগুলির লক্ষ্য।

আজকে আমরা একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপের প্রস্তাব করছি: সকল রাষ্ট্র কর্তৃক পরমাণু অস্ত্রের উৎপাদন যুগপৎ বন্ধ করা সম্পর্কে ঐকমত্যে উপনীত হতে হবে। এরূপ সমস্ত অস্ত্র—পরমাণু, হাইড্রোজেন কিংবা নিউট্রন বোমা কিংবা ক্ষেপণাস্ত্র। একই সময়ে পরমাণু অস্ত্রধর শক্তিগুলি এরূপ অস্ত্রের বিদ্যমান মজুত ক্রমশ হ্রাস করার কাজ শুরু করতে পারে এবং এগুলির পূর্ণ, সার্বিক ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে পারে। শুধুমাত্র

শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণুর শক্তি ব্যবহৃত হোক—সোভিয়েত রাষ্ট্র তার ৬০তম বার্ষিকী বছরে বিভিন্ন সরকার ও জাতিগুলির কাছে এই আহ্বানই জানাচ্ছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ হ্রাস করার কর্তব্যকার্যের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এটি হল পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার কাজে সফল পরিসমাপ্তি ঘটানো যাতে করে ভূগর্ভে তথা আবহমণ্ডল, মহাকাশে ও জলতলে এরূপ পরীক্ষাকার্য আর চালানো না হয়। আমরা এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনায় অগ্রগতি অর্জন করতে এবং এই আলাপ আলোচনার সফল সমাপ্তি ঘটাতে চাই। সেইজন্যই আমরা বলছি, একটা নির্দিষ্ট কালপর্বের জন্য সমস্ত পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ স্থগিত রাখা সম্পর্কে ঐকমত্যে উপনীত হতে প্রস্তুত। আমরা বিশ্বাস করি আলাপ আলোচনায় আমাদের শরিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নের এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করবে, এবং জাতিসমূহের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি চুক্তি সম্পাদনের পথ এভাবে পরিষ্কার করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আস্থাসহকারে শান্তির পথ অনুসরণ করছে। আমাদের সক্রিয় ও সুসঙ্গত নীতি হল, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার নিষ্পত্তি যেন রণক্ষেত্রে, সমরোপকরণের কনভেয়রে না হয় বরং যেন হয় শান্তিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে। আমরা চাই এই দুনিয়ার মাঝখানের সীমান্তকে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র অতিক্রম করবে না, অতিক্রম করবে সকল মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সহযোগিতার স্বর্ণসূত্র। অবিচলভাবে এই কর্মনীতি অনুসরণ করে আমরা পালন করছি অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম প্রধান স্লোগান ও লেনিনের নির্দেশ: জাতিসমূহের জন্য শান্তি চাই।

আর একটি বিশ্বযুদ্ধ নিবারণ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান সমস্যাটির সমাধান করা যদি সম্ভব হয় তাহলে পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। অন্য অনেক যে সমস্ত একান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আজকে সমগ্রভাবে মনুষ্যজাতির সামনে হাজির হচ্ছে সেগুলির সমাধান করার পূর্বশর্ত সৃষ্টি হবে।

এই সমস্যাগুলি কি?

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই রকম একটি সমস্যা হল—এক বিপুল

জনসংখ্যার জন্যে খাদ্য, কাঁচামাল আর শক্তির সম্পদ-সঙ্গতি জোগানো। মনে রাখতে হবে, প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী, পৃথিবীর জনসংখ্যা ৪০০ কোটি থেকে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ বেড়ে দাঁড়াবে ৬০০ কোটিতে আরেকটি সমস্যা হল—এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে উপনিবেশবাদ কর্তৃক রেখে যাওয়া অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটানো। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবী সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর জন্যে, এবং সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতির জন্যে, এটা দরকার। সব শেষে বলতে হবে—এবং এটা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—নানা ধরনের সেই বিপদ-গুলি থেকে মানুষকে রক্ষা করার সমস্যাটির কথা—আরো বেশি পরিমাণে অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তিবিদ্যাগত উন্নয়নের ফলে যে-বিপদগুলি তার পক্ষে আশঙ্কা সৃষ্টি করছে ; অর্থাৎ, মানুষের জন্যে প্রকৃতি সংরক্ষণের সমস্যা।

এগুলি অত্যন্ত বাস্তব আর গুরুতর সমস্যা। সুসংবদ্ধ এক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত এইসব সমস্যার যুক্তিযুক্ত যৌথ মীমাংসা না করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি নতুন দশক শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি আরো তীব্র হয়ে উঠবে।

আমাদের কালে এই দুনিয়াটা সামাজিক দিক থেকে অসমসত্ত্ব—এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহ। এটা বাস্তব ঘটনা। কোন্ পন্থায় অগ্রসর হলে মানবজাতির সম্মুখে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সবচেয়ে ভাল সমাধান করা যেতে পারে, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক অংশটি তার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন-সাধনের দ্বারা আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কসমূহের প্রতি তার মনোভাবের দ্বারা সেই পন্থাগুলির একটি ভাল উদাহরণ স্থাপন করছে। কিন্তু, বলা-বাহুল্য, সে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সেগুলির সমাধান ঘটাতে পারে না। এ ক্ষেত্রে যেটা দরকার, তা হল—প্রত্যেক দেশের জনগণের উদ্দেশ্যাভিমুখী প্রয়াস, সর্ব দেশের, সমস্ত জাতির ব্যাপক ও গঠনমূলক সহযোগিতা। সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বান্তঃকরণে এ ধরনের সহযোগিতার পক্ষে। যদি আরো তলিয়ে দেখা যায়, তাহলে, এরই মধ্যে রয়েছে পররাষ্ট্রনীতির সেই পন্থাটির সারমর্ম—যেটাকে আমরা বলি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পন্থা।

কমরেডগণ ও বন্ধুগণ, অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যসমূহ আর সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনাগুলিই আজ মানবজাতির আরো অগ্রগতি সাধনের সবচেয়ে নিশ্চিত গ্যারান্টি। অক্টোবর বিপ্লবই বিরাট সব পরিবর্তনের সেই পতাকা যেটাকে

মেহনতী জনগণের ইচ্ছা আর হাতগুলি বিংশ শতাব্দীর উপরে তুলে ধরেছে।

আমরা এমন এক যুগের দিকে এগুচ্ছি, যে-যুগে কোন-না-কোন এক সুনির্দিষ্ট, ইতিহাস-নির্ধারিত রূপে সমাজতন্ত্রই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াবে, তা সঙ্গে নিয়ে আসবে শান্তি, মুক্তি, সাম্য এবং সমগ্র মেহনতী মানবজাতির জন্যে কল্যাণ।

এটা কোন কল্পরাজ্য নয়, সুন্দর সুখস্বপ্ন নয়। এ এক বাস্তব সম্ভাবনা। কমরেডগণ, আমাদের শ্রম আর সংগ্রামগুলির দ্বারা প্রতিদিন একে নিকটতর করে তোলা হচ্ছে। একে নিকটতর করে তোলা হচ্ছে আমাদের সমকালীন কোটি কোটি মানুষের শ্রম আর সংগ্রামগুলির দ্বারা। অক্টোবর বিপ্লব যে লক্ষ্য সাধনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, এ হল তারই অব্যাহত ধারা।

অক্টোবর বিপ্লবের পতাকার প্রতি, বিপ্লবের রক্ত পতাকার প্রতি আমরা যেন চির-বিশ্বস্ত থাকি!

অবিনশ্বর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শগুলির আলো এই দুনিয়ার উপরে ক্রমাগত আরো উজ্জ্বলভাবে জাজ্বল্যমান থাকুক!

মহান সোভিয়েত জনগণ জিন্দাবাদ!

আমাদের মহান পার্টি, লেনিনের পার্টি, জিন্দাবাদ!

আগুয়ান হও কমিউনিজমের জয়ের লক্ষ্যে!

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিত

সত্য রায়

আজকের দিনে আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে, তা হচ্ছে জনতা ও কংগ্রেস, উভয়েরই বিপরীত বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের এক তৃতীয় বিকল্প সৃষ্টি করা। কেন এই তৃতীয় বিকল্প? কারণ তিরিশ বছরের কংগ্রেসী শাসন যেমন ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত করতে পারে নি, বরং সংকটকে আরো তীব্র ও গভীরতর করেছে, তেমনি বর্তমানে জনতা পার্টির শাসনও সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাতে পারছে না। অধিকন্তু, জনতা পার্টি আরো দক্ষিণ ঘেঁষা নীতি নিয়ে চলেছে, যার ফলে সমগ্র জাতীয় জীবনে এক বিপর্যয় নেমে আসছে। অর্থনৈতিক সংকট আজ এক জাতীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটে পরিণত হয়েছে। জনগণ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছে যে পুঁজিবাদী পথে তাদের জীবনের কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বরং এই পথ তাদের জীবনে আরো তীব্র ও সর্বব্যাপী সংকটের সৃষ্টি করছে। সুতরাং তাদের কাছে এই তৃতীয় বিকল্পের প্রশ্নটি এক জরুরী রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে হাজির হয়েছে। অন্যদিকে, ধনিকশ্রেণী জনগণের বিক্ষোভ ও অসন্তোষকে বিপথে চালিত করার জন্য দুই পার্টি ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে চাইছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে এই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের বিকল্প নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রায় সমস্ত বামপন্থী পার্টিই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের স্লোগান তুলছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রকৃত অর্থে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কারণ, সঠিক শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যকে বিচার করা হচ্ছে না। কেউ কেউ মনে করছেন যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলোর ঐক্যই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য। আবার কেউ কেউ মনে করছেন যে কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের ঐক্যই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য।

শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করলে, এবং এই ঐক্যকে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পটভূমিকায় বিচার না করলে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য সঠিক ভাবে গড়ে উঠতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য আমাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ও বিপ্লবী গণতন্ত্রে উত্তরণের হাতিয়ার।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য—এক অন্তর্বর্তীকালীন স্লোগান।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতেই এই ঐক্যকে বিচার করতে হবে। কারণ এই ঐক্য জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রস্তুত হবে। সুতরাং, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে, এই ঐক্য কখনোই গড়ে তোলা যাবে না। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রধানত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দি ভেঙ্গে সমাজতন্ত্রে এর উত্তরণ ঘটে। তাই, প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও, শেষ পর্যন্ত এই বিপ্লব সমস্ত রকম শোষণমূলক সম্পর্কের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী স্তর থেকে পুঁজিবাদবিরোধী স্তরে এই বিপ্লবের উত্তরণ ঘটে। এই দিক থেকে, এই বিপ্লব হচ্ছে সমাজতন্ত্রমুখীন এক নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এটা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে এই বিপ্লব ঘটছে এক নতুন যুগে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে, যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী ও তার সৃষ্ট বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই উত্তরণের গতিমুখকে নির্ধারিত করছে ও সমস্ত দেশের জাতীয় মুক্তি বিপ্লবকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।

এই বিপ্লবের শ্রেণীবিন্যাসও পুরানো ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে পৃথক। পুরানো ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী, যার লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া রাজ বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিক ও কৃষক,

যার লক্ষ্য হবে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে, অবতান্ত্রিক পথের মাধ্যমে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করার পূর্বশর্ত সৃষ্টি হবে। কিন্তু, যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজির সাথে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বন্দ্ব আছে, সেহেতু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী ভূমিকা আছে। এই কারণে, এরাও এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম শক্তি, যদিও এরা প্রধান চালিকা শক্তি নয়। এরা পুঁজিবাদী পথের প্রতিনিধিত্ব করে এবং দৃঢ়চিত্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী ভূমিকা পালন করতে পারে না। এরা জানে যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম যত তীব্র ও গভীর হবে, তত এই সংগ্রাম তাদের শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। সেইজন্যই, এরা শেষপর্যন্ত পুঁজিবাদী পথকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজির সাথে আপস করে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই চরিত্র ও শ্রেণী সমাবেশের কথা মনে রেখেই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের চরিত্র নির্ধারিত করতে হবে। যদিও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য সম-অর্থবাচক নয়, তবুও এই ঐক্য এই বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব। সুতরাং, বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের শ্রেণীগত ভিত্তি, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রেণীগত ভিত্তি থেকে পৃথক নয়। বরং বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের শ্রেণীগত ভিত্তি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে আরো দৃঢ় ও সংহত হয় এবং আরো উন্নত রূপ ধারন করে।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য কাকে বলে ?

বামপন্থার সংজ্ঞা কি ? যে সব শ্রেণী ও সামাজিক শক্তি সমস্ত ধরনের শোষণের (সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তারাই হচ্ছে বামপন্থার ভিত্তি। এই সব শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শক্তি হচ্ছে কৃষক। কারণ, আমাদের মতো দেশে যেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ বেশ কিছুটা হলেও, সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রাধান্য রয়েছে, সে সব দেশে গণতন্ত্রের মূল উপাদান হচ্ছে কৃষক গণতন্ত্রের উপাদান। কৃষকদের সামন্ততন্ত্র ও প্রাক-পুঁজিবাদী শোষণের কবল থেকে মুক্ত করাটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। লেনিন

ঔপনিবেশিক দেশগুলোর বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন বলেছিলেন এই কারণে যে কৃষক হচ্ছে এই বিপ্লবের প্রধান ধারক, এরা বুর্জোয়া সম্পর্কের প্রতিনিধি। কিন্তু এরা নির্যাতিত জনগণেরই অংশ যাদের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সাথে আপস করার কোন পিছুটান নেই। তাই কৃষক সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে যেতে আগ্রহী। এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এদের এই চূড়ান্ত সংগ্রাম শেষপর্যন্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিমূলকে আঘাত করে। সুতরাং, এদের এই সংগ্রাম পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়। কিন্তু এটা সম্ভব হয় তখনই যখন কৃষকদের সংগ্রামের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম সচেতনভাবে যুক্ত হয়। শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী দেশের জনগণের ব্যাপকতম অংশের মৈত্রী, কারণ এরাই হচ্ছে দেশের জনগণের ব্যাপকতম অংশ। সুতরাং শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীই হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের মেরুদণ্ড।

বামপন্থী শক্তির আরেকটি অংশ হচ্ছে শহর ও গ্রামের পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী। পেটিবুর্জোয়ারাও নির্যাতিত শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। কাজেই এরাও সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শোষণের শিকার। এদের মধ্যে দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী উপাদান রয়েছে। এরাও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামে পরিণত করতে আগ্রহী। এদের মধ্যে দুটি প্রবণতা আছে। এদের একটি অংশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত; এবং এরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখতে চায়। এরা জাতীয় বুর্জোয়ার অনুগামী। এদের আরেকটি অংশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দি ভেঙ্গে সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়। এরাই বিপ্লবী গণতন্ত্রীতে পরিণত হয়। এদের এই অংশই হচ্ছে বামপন্থার অন্যতম সামাজিক ভিত্তি। এশিয়া ও আফ্রিকার সমাজতন্ত্রমুখীন দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এই সব দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছে পেটিবুর্জোয়াদের বামপন্থী অংশ, যারা বিপ্লবী গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের দেশেও পেটিবুর্জোয়াদের বিপ্লবী গণতন্ত্রের উপাদান নিহিত রয়েছে। সুতরাং, শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টিকে পেটিবুর্জোয়াদের সংগ্রামের সাথে ঐক্য স্থাপন করে বিপ্লবী গণতন্ত্রের উপাদান জাগিয়ে তুলতে হবে। অতএব, শ্রমিক-কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াদের ঐক্যই বামপন্থী ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করবে।

কিন্তু, শুধুমাত্র বামপন্থী ঐক্যই তৃতীয় বিকল্প সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কারণ বামপন্থী শক্তি ছাড়াও জনগণের এক বিরাট অংশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবে রয়েছে। এরা শ্রমজীবী জনগণের তুলনামূলক-ভাবে কম সচেতন অংশ। এরা দৃঢ় ও সুস্থিত গণতান্ত্রিক শক্তি নয়। কারণ এদের সংগ্রাম সমস্ত রকম শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের মতো পশ্চাৎপদ দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে, সেহেতু এরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামে অংশ-গ্রহণ করে। যদিও এরা গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে চায় না, তবুও এরা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মিত্র। এদের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিজীবীর এক ব্যাপক অংশ ও জাতীয় বুর্জোয়ার দেশপ্রেমিক অংশ। এদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার অর্থ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শ্রেণীভিত্তিকে সংকুচিত করা ও সংগ্রামকে দুর্বল করা। এ প্রসঙ্গে, বিশেষ করে মনে রাখতে হবে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকার কথা। আমাদের দেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য রয়েছে। যদিও পুঁজিবাদী পথের সংকট প্রকট হওয়ার ফলে ও শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার ফলে, তাদের মধ্যে আপসের প্রবণতা বেড়েছে, তবুও তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা নিঃশেষিত হয় নি। সুতরাং, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার যথাযথ সুযোগ নিতে হবে। তা না হলে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে মৈত্রী কখনো বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তি হতে পারে না। কারণ জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈত ভূমিকা জনগণের স্বার্থে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এদের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করা। বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বামপন্থী ঐক্যই হচ্ছে প্রথম, কারণ এই ঐক্যই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সুদৃঢ় বনিয়াদ রচনা করবে এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের গ্যারান্টি হয়ে দাঁড়াবে। যাঁরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক ঐক্যকে প্রথম ও বাম-গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তি বলে মনে করেন, তাঁরা গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মধ্যে আটকে রাখতে চান। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ

সমাজের ব্যাপকতম অংশ, শ্রমজীবী জনগণকে এখন আর ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না, কারণ সামাজিক মুক্তির প্রশ্নটি জনগণের কাছে প্রধান প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। আর যাঁরা বাম ঐক্যকে একমাত্র ঐক্য বলে মনে করেন ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর, বিশেষ করে, জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকাকে অস্বীকার করেন তারাও গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে জনগণের এক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন সংগ্রামে পরিণত করতে চান। এই দুই প্রবণতাই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের পরিপন্থী।

যাই হোক, বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের লক্ষ্য হবে দেশকে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়া; কারণ বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের পথেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হতে পারে। সুতরাং, বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির মোর্চাকে একটি সুদম অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে হবে। দেশের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামকে সমর্থন করতে হবে ও তাকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যে শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে তার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এই মোর্চাকে। কারণ আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের সাথে সংযুক্ত করেই দেশের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামকে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিকশিত করা যায়। দেশের মধ্যে বিদেশী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা, মূল শিল্প জাতীয়করণ, কৃষকের স্বার্থে আমূল ভূমি সংস্কার, মেহনতী জনগণের স্বার্থে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ প্রভৃতির জন্য সংগ্রামের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা, শান্তিকামী শক্তিগুলোর বন্ধুত্ব ও অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাঝে সংহতি সৃষ্টি করতে হবে। এইভাবে, আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের সাথে দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রামকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক মোর্চাকে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার স্তরে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

কমিউনিস্ট ঐক্য—বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তি

কমিউনিস্ট ঐক্য, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যই হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তি। কারণ, এই দুই পার্টিই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রধান প্রবক্তা। দুই পার্টির লক্ষ্যই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। দুই পার্টির মতাদর্শ হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী

দুই পার্টির কর্মসূচীর লক্ষ্য। দুই পার্টিই জনগণের সংগ্রামের পুরোভাগে থাকে। সুতরাং, দুই পার্টির ঐক্য জনগণের ঐক্যকে সুদৃঢ় করবে ও সম্প্রসারিত করবে এবং জনগণের সংগ্রামকে সুসঙ্গত রূপদান করবে।

এটা ঠিক যে দুই পার্টির নীতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ভারতের বিপ্লবের চরিত্র, শ্রেণী বিন্যাস ও নেতৃত্ব ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ে দুই পার্টির অবস্থান ভিন্ন। এটা ঠিক যে, আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সাধারণ লাইনের সাথে সি. পি. এম একমত নয়। কিন্তু এইসব বিষয়ে পার্থক্য আমাদের ঐক্যের পথে বাধা হতে পারে না। জনগণের প্রতি কর্তব্য, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থ দুই পার্টিকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। এই ঐক্য সৃষ্টি করার জন্য দুই পার্টিকে ঐক্যের ভিত্তি খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হতে হবে। কারণ আমাদের পারস্পরিক মতভেদ কেবলমাত্র নীতিগত বিতর্ক তুলে সমাধান করা যাবে না। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই মতভেদের অবসান ঘটবে।

দুই পার্টির এই ঐক্যকে অন্যান্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলোর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে, কংগ্রেসের মধ্যেকার প্রগতিশীল, এমনকি মধ্যপন্থীদের সাথেও ঐক্য স্থাপন করার কথাও ভাবতে হবে। কারণ, সারা ভারতে কংগ্রেস এখনও এককভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী পার্টি। এর গণভিত্তি এখনও সবচেয়ে শক্তিশালী। সুতরাং, কংগ্রেসের ভিতরকার গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে ঐক্য স্থাপন করতে না পারলে, কংগ্রেসের অনুগামী জনগণের এক বৃহৎ অংশ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসের সাথে শুধু আমাদের ঐক্য বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রতিভূ নয়। কংগ্রেস মূলত ভারতের সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীর পার্টি। এদের সাথে ঐক্য প্রয়োজন; কিন্তু এই ঐক্য কখনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তি হতে পারে না। তা ছাড়া, কংগ্রেসের মধ্যে বিরাটসংখ্যক পেটিবুর্জোয়া রয়েছে। কিন্তু এরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবের অধীন। এরা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত হয়ে সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে খুব আগ্রহী নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এরা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশীদার। সুতরাং, এদের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। এদের মধ্যে বিপ্লবী গণতন্ত্রের উপাদান রয়েছে। এদেরকে বিপ্লবী গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে হলে এদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। গণতান্ত্রিক

আন্দোলনে এদের, সাথে ঐক্য বাম ও গণতান্ত্রিক মোর্চাকে সম্প্রসারিত করবে। তাই, এদের সাথে ঐক্যকে ছোট করে দেখাটা ভুল হবে। আবার, অন্যান্য বামপন্থী শক্তিকে অস্বীকার করে একমাত্র এদের সাথে ঐক্যকে বড় করে দেখাটা ভুল হবে। বামপন্থীদের ঐক্যের ওপর ভিত্তি করেই এদের সাথে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। কংগ্রেসের মধ্যে বর্তমানে যে সংকট চলছে, তা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সংকটের প্রতিফলন। এই সংকটের ফলে অন্যান্য বামপন্থী শক্তিগুলোর সাথে এদের ঐক্যের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। একমাত্র কংগ্রেসের প্রগতিশীলদের সাথে ঐক্য করার বা এই ঐক্যকে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে ধরার যে প্রবণতা আমাদের মধ্যে রয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। তেমনি এদের প্রতি সি. পি. এমের নেতি-বাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করতে হবে। তাহলে ব্যাপক বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সম্ভাবনা আরো বেশী বাস্তব হয়ে উঠবে।

এই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলতে হলে কমিউনিস্ট পার্টিকে তার স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে বাম ও গণতান্ত্রিক মোর্চার চারপাশে সমবেত করে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারা সৃষ্টি করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টিকে এক জাতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের মেরুদণ্ড, শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। অন্যদিকে, বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা তৈরী করার সাথে সাথে ভ্রান্ত মতাদর্শগত অবস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। ভ্রান্ত অবস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের শক্তি অগ্রসর হতে পারবে না। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের দিকে এদের নিয়ে আসার জন্যও সংগ্রাম চালাতে হবে।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য শুধু বিভিন্ন পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে না; গণসংগ্রামের মধ্য দিয়েও এই ঐক্য গড়ে উঠবে। বিভিন্ন গণ সংগঠন, সর্বাগ্রে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা, মহিলা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে—মিলিত সংগ্রামের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠবে এই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের বনিয়াদ।

এর পাশাপাশি গড়ে তুলতে হবে নির্বাচনী মোর্চার ক্ষেত্রেও বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্য।

এই নীতিভিত্তিক বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের আন্দোলনই হচ্ছে বর্তমান ভারতবর্ষের সামনে এক তৃতীয় বিকল্প।

ভারতবর্ষের ধনিকশ্রেণী দুই পার্টির শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধ-পরিকর। কারণ এই দুই পার্টিই ভিন্নভাবে হলেও, ধনতন্ত্রের পথই অনুসরণ করবে।

সুতরাং, বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের বিকল্পই আজ জাতীয় দাবী, এই মুহূর্তের প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মেহনতী মানুষ সাগ্রহে এই তৃতীয় বিকল্পের জন্যই অপেক্ষা করছে।

জরুরী অবস্থা ও ভারতের অর্থনীতি

চারুব্রত রায়

জরুরী অবস্থার উনিশ মাস ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়। ভারতের জনমত সুস্পষ্টভাবে এর বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছে। অথচ জরুরী অবস্থা সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠেছিল একশ্রেণীর মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী যাঁরা বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে, জরুরী অবস্থা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুকূলতা-সৃষ্টি করবে। পশ্চিমবঙ্গের জনৈক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী দিল্লীর 'প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখলেন যার বিষয়বস্তু হল ২০ দফা কর্মসূচী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম স্তর।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা থেকে জরুরী অবস্থাকালীন কার্যকলাপের জনবিরোধী চরিত্রের জবাব দিয়েছে জনগণ, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের বদলে ক্ষমতায় এনেছে আরো দক্ষিণপন্থী জনতা সরকার। কি এমন হল যে, নিপীড়নে উত্যক্ত জনগণ আর এক দক্ষিণপন্থী শক্তিসমবায়কে ক্ষমতাসীন হতে সাহায্য করল? জনগণের কাছে একনায়কতন্ত্রের বিপদ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কি তার রাজনৈতিক বিষয়গত বিশ্লেষণ? বাম ও গণতান্ত্রিক রণনীতি ও রণকৌশল রচনাকল্পে এ বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী, অথচ এই অতীব প্রয়োজনীয় কর্তব্য অবহেলিত। জনতা দল তাঁদের ক্ষমতাসীন হওয়াকে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলে অভিহিত করছে অথচ বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলি এর জবাব দেবার কথা কেউ ভাবছে না। এই সব কারণেই জরুরী অবস্থার উনিশ মাসকে বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করতে হবে। যেহেতু রাজনীতি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাজনীতির সঘন অভিব্যক্তি, জরুরী অবস্থার সময়কার অর্থনৈতিক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান নিবন্ধে সেই দিকটা নিয়েই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হবে এবং কয়েকটি অর্থনৈতিক নির্দেশিকার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করবে।

জরুরী অবস্থার মধ্যেই সংসদে সি. পি. আই সংসদীয় নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বলেছিলেন যে জরুরী অবস্থার প্রথম বছরে ভারত সরকার একচেটিয়া পুঁজি

ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের যত সুবিধা দিয়েছেন, স্বাধীনতোত্তর ভারতে তা অভূতপূর্ব। ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণার সময় দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিপদের পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেছিলেন। অথচ দক্ষিণপন্থী প্রতিবিপ্লবের অর্থনৈতিক ভিত্তির অন্যতম প্রধান অংশ হল বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজি। সুতরাং দক্ষিণপন্থী বিপদের পরিপ্রেক্ষিত শ্রীমতী গান্ধী জনমনকে বিভ্রান্ত করার জন্যই বলেছিলেন, কেননা দক্ষিণপন্থাকে খর্ব করা তো দূরস্থান, তাকে পালন করতেই কংগ্রেস সরকার চেয়েছিল।

একের পর এক যদি পর্যায়ক্রমে জরুরী অবস্থার দিনগুলি বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যাবে যে জরুরী অবস্থা অনেক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর সংস্কারবাদী চিন্তাধারার বিদ্রূপাত্মক প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে। এদের অনেকের বক্তব্য ছিল যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা প্রয়োজন ছিল প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে দমন ও বিশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের পথে বাধা অপসারণের জন্য। প্রতি-বিপ্লবী শক্তি বলতে যাদের বোঝানো হয়েছিল (যেন ইন্দিরা গান্ধীর অনুসারীদের মধ্যে প্রতিবিপ্লবী শক্তির চিহ্নমাত্র ছিল না), তারাই জনতা পার্টি গড়েছে। প্রতিবিপ্লবী শক্তির মূল ভিত্তি (অর্থনৈতিক শক্তি) যে আঘাত পায় নি, তার প্রমাণ সাধারণ নির্বাচনে সর্বত্র এদের জয়লাভ। কংগ্রেস সরকার যখন ২০ দফা কর্মসূচীর প্রতি মৌখিক সমর্থন ব্যতীত অন্য কিছুই করছিল না, এরা তখন এক বিচিত্র আত্মসমালোচনা করছিল যে, বিপ্লবী শক্তিগুলি ঐ কর্মসূচী রূপায়ণে আন্দোলন ও উদ্যোগ গড়ে তুলছে না বলেই বিশ দফার রূপায়ণে অগ্রগতি হচ্ছে না। যার কর্মসূচী সে কিছু করবে না, অথচ তাকে দোষ দেওয়া চলবে না—সংস্কারবাদের পরিণতিই এই। দ্বিতীয়ত, তাঁরা লেনিনের শিক্ষা থেকে আহরণে সচেষ্ট নন। ১৮৪৮ সালে ইয়োরোপে বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যর্থতার পর বুর্জোয়ারা আর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন করতে পারে না, একথা লেনিন বলেছিলেন। কারণ এখন আর পুরানো ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ নয়, এখন নতুন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যার পুরোভাগে শ্রমিকশ্রেণী। এই মৌলিক শিক্ষা মনে না রাখলে বুর্জোয়াশ্রেণী বিশ দফা কর্মসূচী পালন করবে, এ ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তৃতীয়তঃ বিশ দফা কর্মসূচী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম স্তর কিনা সেটাও বিচার্য। বিশ দফা কর্মসূচীতে কোথাও পুঁজিতন্ত্রকে আঘাত করার কথা নেই বরং একচেটিয়া পুঁজি ও বৃহৎ পুঁজিকে পোষণ করার

বিস্তৃত সুযোগ ছিল। ঐ কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বিনিয়োগ পদ্ধতির উদারনৈতিকরণ। বিনিয়োগ পদ্ধতির কিছুটা কড়াকড়ি ছিল বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজির ক্ষেত্রে। কারণ মনোপলি এণ্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস কমিশন আক্ট ও তৎসম্পর্কিত বিধিবদ্ধ কমিশন সজীব ছিল। তাহলে প্রশ্ন করতে হয় যে, বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজিকে লালন করে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন সম্ভব, বিশেষত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদিত হয় অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথে? যেখানে আন্তর্জাতিক দলিল এবং বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিকেরা ক্রমাগত বলে চলছেন যে, অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথের মধ্যে ক্রমশ পুঁজিতন্ত্র-বিরোধী ও সমাজতন্ত্রমুখিনতার উপাদান বড়ো হয়ে উঠছে, সেখানে আমাদের তাত্ত্বিকেরা বলছেন যে, পুঁজিতান্ত্রিক পথকে প্রসারিত করেই অ পুঁজিতান্ত্রিক পথে তথা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এ ধরনের চিন্তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধাচার।

সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে জরুরী অবস্থায় ২০ দফা কর্মসূচীর ঐ অংশটিই (বিনিয়োগ পদ্ধতির উদারনৈতিকরণ) কংগ্রেস সরকার সবচেয়ে বেশী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে, জনকল্যাণ কখনোই ছিল না, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল জরুরী অবস্থা ঘোষণার কিছুদিন পর থেকেই ক্রমান্বয়ে শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী জনগণের উপর আঘাত হানা। সঙ্গে সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজির প্রতি সমর্থনও বড়ো হয়ে উঠেছিল। একদিকে সরকার বলে চলেছিলেন যে, তাঁরা ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে অটল, আর অন্যদিকে লে-অফ-ক্লোজার বেড়েই চলেছিল। জুলাই '৭৫ থেকে জুন '৭৬-এর মধ্যে ১,০৫,০০৮ জন শ্রমিক ক্লোজারের বলি হয়েছিলেন ও ৬,৯৬,০৯৮ জন শ্রমিক কাজ হারিয়েছিলেন। এ হিসেব অবশ্য অসম্পূর্ণ, প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা অনেক বেশী ছিল (নিউ এজ, ১০. ২. ৭৭)। জরুরী অবস্থার সময় বোনাসের অধিকার-হরণ শ্রমিকশ্রেণীর উপর আর একটি আঘাত—যা বহুদিনের সংগ্রামে অর্জিত অধিকার। বোনাসের অধিকার হরণ মালিকপক্ষের প্রতি উপঢৌকন, কারণ বোনাস না দেবার অর্থ মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়া। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বিমাতৃসুলভ মনোভাব এবং রাঘলবোয়ালদের প্রতি সহৃদয়তার সবচেয়ে বড় সি·ডি এস ও ডিভিডেণ্ড সংকোচন বিধির প্রশ্নে জরুরী অবস্থাকালীন সরকারী সিদ্ধান্ত। জরুরী অবস্থার অনেক আগেই মুদ্রাস্ফীতিরোধের যুক্তি

দেখিয়ে ইন্দিরা সরকার এ দুটি পদক্ষেপ একই সঙ্গে চালু করেছিলেন। বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলি সেই সময় এর সমালোচনা করেছিল। কারণ ডিভিডেণ্ড সংকোচনের নামে মালিকেরা বিনা সুদে অদেয় অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগের সুযোগ পেয়েছিল, আর অন্যদিকে বেতনভুক মানুষের পারিবারিক ব্যয় খাতে ক্ষমতা কমে এসেছিল। জরুরী অবস্থার সময় সি-ডি এস-এর মেয়াদ বাড়ানো হল, কিন্তু ডিভিডেণ্ড সংকোচন বিধি তুলে নেওয়া হল. যাতে তাদের শেয়ার মূল্য বেড়ে যায়। তখন আর মুদ্রাস্ফীতির কথা ইন্দিরা গান্ধী বা সুব্রহ্মনিয়মের মনে পড়ে নি।

এই না হলে কে. কে. বিড়লা কেন বলেন যে, পরিস্থিতি চমৎকার এবং জরুরী অবস্থা অনেক আগেই জারী করা উচিত ছিল (হিন্দুস্তান টাইমস ১১. ৮. ৭৬)। ডিভিডেণ্ড সংকোচন প্রত্যাহৃত হলে যে শিল্পপতিরা কিরূপ লাভবান হয়েছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত নতুন ইকুয়িটি পুঁজির সঞ্চালক ক্ষমতার অকস্মাৎ বৃদ্ধি। ১৯৭৫-৭৬ সালে ৬৭·১ কোটি টাকার নতুন ইকুয়িটি পুঁজি লগ্নী হয়েছে (দ্রষ্টব্য: ইকনমিক টাইমস ২৬. ৭. ৭৬)—কংগ্রেস বিভক্তির পরে এই লগ্নী সর্বোচ্চ।

জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট প্রণয়নেও এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এন. এ. পালখিওয়ালা, যিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বড় সমালোচক ও বেসরকারী ক্ষেত্রের অকুণ্ঠ সমর্থক। ইনি ১৪. ৩. ৭৫ তারিখে স্টেটসম্যান পত্রিকায় কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ লিখলেন, বললেন এ বাজেট অর্থনৈতিক বিকাশের সহায়ক নয়—গরুর গাড়ি মার্কা বাজেট। ১৯৭৬-৭৭ সালে সেই পালখিওয়ালাই তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সুব্রহ্মনিয়মকে অভিনন্দিত করলেন। আর কমিউনিস্ট এম. পি. হীরেন মুখার্জি বললেন ধনীদের বাজেট। ঐ বাজেটে কংগ্রেস সরকার আবগারী শুল্ক কমিয়ে আনলেন এমন সব পণ্যের ক্ষেত্রে, যেগুলি প্রধানত হিন্দুস্থান লিভার, কলগেট-পামোলিভ ইত্যাদি বিদেশী আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন তৈরী করে—যেমন সাবান, প্রথালক ও পরিশোধক পণ্য প্রভৃতি। তেমনই শুল্ক হ্রাস করা হল টেলিভিশন সেট, টায়ার, টিউব, ব্যাটারি প্রভৃতির ক্ষেত্রে। এগুলিও প্রধানত সিংঘানিয়া, মোদী প্রভৃতি দেশীয় একচেটিয়া গোষ্ঠী ও ডানলপ, ট্রান্সিয়ন কারবাইড, গুড ইয়ার, ফায়ারস্টোন প্রভৃতি বড় বড় মার্কিনী ও

ব্রিটিশ কর্পোরেশনগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগে ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ ভাতা চালু করেন (কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও, জনতা সরকার প্রথম বাজেটে এই ভাতা ৩৫ শতাংশে বাড়িয়ে দিয়েছেন, প্রযোজ্য শিল্পপণ্য সংখ্যাও বাড়িয়েছেন)। পালখিওয়ালা কেন খুশী হবেন না? এখানেই শেষ নয়, শহর সম্পত্তির উপর সম্পদকর প্রত্যাহার ও সর্বোচ্চ আয়ের উপর আয়কর ৭৭ থেকে ৬৬ শতাংশে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্তও হাইবরোয়ালদের পদলেহনের দৃষ্টান্ত। এই আয়কর হার ৯৭ শতাংশ থেকে ৭৭ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রশ্নে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত বলেছিলেন: "যখন ব্যক্তিগত আয়করের সর্বোচ্চ হার ৭৭ শতাংশে (সারচার্জ সহ) কমিয়ে আনা হয় দুবছর আগে, তখনই আয়করের প্রগতিশীল চরিত্র যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্প্রভ হয়ে আসে।" শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম বলেছিলেন যে, আয়কর ফাঁকি এতে কমবে। ৬৬ শতাংশ থেকে শূণ্য শতাংশে নামালে আয়কর ফাঁকি একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। খাসা যুক্তি বটে।

এ না হলে কি আর পালখিওয়ালার সার্টিফিকেট মেলে। ধনিকবনিক সংঘ সমিতিগুলিও ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটের জন্য কংগ্রেস সরকারের প্রশস্তি করেছে। তার আর একটা কারণ শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম বাজেট প্রণয়নের আগে শিল্পপতিদের পরামর্শ নিয়েছিলেন। বাজেট বক্তৃতার পরোক্ষকর সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের গোড়াতে তিনি বলেছেন: "এ বছরের বাজেট প্রণয়নের আগে আমি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিভিন্ন বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলাম।"

কিন্তু জরুরী অবস্থার অর্থনীতি যে কতখানি জনবিরোধী তথা বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সহায়ক হয়েছিল, তার সবচেয়ে বড়ো প্রতিফলন হল খোদ মার্কিন সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের মুখপত্র 'কমার্স আমেরিকা'য় ভারত সরকারের প্রশস্তি। ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে কমার্স আমেরিকা পত্রিকায় বলা হল: "স্বাধীনতোত্তরকালে ভারত তার সবচেয়ে জটিল সংকট কাটিয়ে উঠেছে এবং গত এক বছরে ভারতীয় অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য বাঁক নিয়েছে" (সমাচার ৪।৮।৭৬, হিন্দুস্তান টাইমস ৫।৮।৭৬)। আরো বলা হল যে, সরকারে, নীতিসমূহে শৃঙ্খলা, কঠোর শ্রম ও জাতীয় সচেতনতার দিকনির্দেশ রয়েছে। দীর্ঘ ঐ পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রেকর্ড খাদ্যশস্য

কলন, শিল্পবাণিজ্য মহলে সরকারের প্রয়োজনানুগ নীতিগুলি ১৯৭৬-৭৭ সালে অর্থনৈতিক বিকাশগত পুনরুজ্জীবনের আশা জাগিয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটকে পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল বলে বর্ণনা করা হয়েছে, বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প লাইসেন্স বিধি শিথিলকরণের জন্য বাহবা দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষে এই পরিস্থিতির প্রতি মার্কিন ব্যবসায়ী মহল তথা আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলিকে আহ্বান করে বলা হল: স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বীকৃত সুযোগ মার্কিন সংস্থাগুলির আকর্ষণীয় সুযোগ হয়েছে। তারা তাদের পণ্য, কৃতাক ও যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রকৌশলগত ব্যবধান কমাতে পারে।"

জরুরী অবস্থার সময়ে ইন্দিরা সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক ধরণের আপোষমুখিনতা দেখিয়েছিলেন, তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। 'কমার্স আমেরিকা' হঠাৎই যে ঐ দীর্ঘ প্রশংসাসূচক পর্যালোচনা লিখেছিল, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। এটা ছিল এক দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় পরিণত বক্তব্য। এ আলোচনায় সেই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। কালক্রমিকভাবে তুলে ধরছি সংক্ষেপে। জরুরী অবস্থা জারী হবার কিছুদিন পরেই বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিধি শিথিল করা হল, যার বলে বিদেশী সংস্থাগুলি ভারত থেকে রপ্তানী সাপেক্ষে ৭৪ শতাংশ মালিকানাসত্ব রাখতে পারে। প্রথমত, রপ্তানীভিত্তিক বিকাশের তত্ত্ব বিশ্বব্যাংক এর, যা অনুসরণ করে তৃতীয় দুনিয়ার বহু রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ভারতের উদাহরণই দেওয়া যাক, ১৯৭৬-৭৭ সালে ভারত আমদানী-রপ্তানী করে ৭০ কোটি টাকা (৫২ কোটি টাকা নয়, বাণিজ্যমন্ত্রকের সর্বশেষ হিসাব মতে) বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অর্জন করেছে। কিন্তু রপ্তানীপ্রসার, বিভিন্ন ভরতুকি, বিক্রয়কর ছাড়, আবগারী শুল্ক প্রত্যর্পণ ইত্যাদি খাতে কমপক্ষে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিধির শিথিলকরণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসেরই নিদর্শন। এখানে উল্লেখ যে, জনতা সরকারও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, বাণিজ্য-মন্ত্রি হরুভাই 'তুর্কি' মোহন ধাড়িয়ার নেতৃত্বে। তার কিছুদিন বাদে (ফেব্রুয়ারী '৭৬) ভারতে মার্কিনী আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলির পক্ষ থেকে অর্ভিন ফ্রিম্যানের নেতৃত্বে এক বাণিজ্য প্রতিনিধি দল, তার মাস দু/তিন আগে ভারত থেকে শিল্পপতি রনাক সিং এর নেতৃত্বে ভারতীয় শিল্পপতিদের এক প্রতিনিধিদল মার্কিন মুলুকই সফর করে আসে। রনাক সিং স্বয়ং ইস্ট আমেরিকান

কাউন্সিল অফ কমার্স এণ্ড ইনডাস্ট্রি আয়োজিত এক বক্তৃতায় বলেন যে, দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবেচনা, বিনিয়োগের লভ্যাংশ হার, মুনাফা ও ডিভিডেণ্ড দেশান্তরীকরণে ভারতের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রমাণ করবে যে ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ এক "চমকপ্রদ" প্রস্তাব। শ্রীসিং আরো বলেন যে, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সালে প্রস্তুত পণ্য উৎপাদনে মার্কিন মুনাফা ৭·৫ শতাংশ থেকে ১৫·৮ হারে বেড়ে গেছে—যা কানাডা, ইওরোপ, লাতিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে বেশী (ইকনমিক টাইমস ১১।১২।৭৫)। তার দু'মাস পরে ফ্রিম্যান এসে বললেন যে, বিশ্ব আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্যই আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন গুলির প্রয়োজন এবং ভারতের উচিত জাতীয়তাবাদী পথ ছেড়ে মুক্তিনির্ভর মানবতাবাদের আশ্রয় নেওয়া (স্টেটসম্যান ৩।২।৭৬)। কি অদ্ভুত যুক্তি। স্বয়ম্ভরতার পথ নেওয়া মানে উগ্র জাতীয়তাবাদকে লালন করা। অতএব আর কেন, নয়া উপনিবেশবাদের অধীনতাই ভালো—তা হবে মুক্তিশীল মানবতা।

কিন্তু ফ্রিম্যানকে এখানে আসার ও একথা বলার সাহস দিল কে? ইতিপূর্বে তিরিশ বছরে কোন দিন এটা ঘটেছে? শুধু তাই নয়, ভারতের রাজনীতিতে বসে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উপদেশ দেন যে, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে হবে (বিজনেস স্টাণ্ডার্ড ৪।৩।৭৬)। জরুরী অবস্থায় এ সুযোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেস সরকার। অরভিন ফ্রিম্যান আমেরিকার 'টাইম-ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে বললেন যে, মার্কিনী শিল্পসংস্থাগুলি ভারতে পুঁজিলগ্নী করতে আগ্রহী। তিনি ঐ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন :

'The reception I had in India last February was a very warm and cordial one. The government officials at the highest level were very receptive, very courteous and seemed very sincere in trying to find out thinking of the American business Leaders" (ইকনমিক টাইমস, ৭।৯।৭৬)।

জরুরী অবস্থার সময়ে যে ভারতে অর্থনীতিক্ষেত্রে নয়া উপনিবেশবাদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়েছিল এ ধারণা পোষণ করার যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি আছে। এটা যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় রাজনৈতিক মহলেও তার স্পর্শ লেগেছিল. ভারতের পররাষ্ট্র নীতির

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপাদানেও তার প্রভাব পড়েছিল। ১৯৭৬ নাইরোবিতে চতুর্থ উংকটাড (UNCTAD) সম্মেলনে কিসিংগারের আন্তর্জাতিক সম্পদ ব্যাংকের বিপজ্জনক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তৃতীয় দুনিয়ার প্রায় সমস্ত দেশ (এমনকি ফিলিপাইনস) গর্জে উঠেছে, জোটনিরপেক্ষতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ভারতের প্রতিনিধিদল তার মধ্যে ইতিবাচকতা খুঁজে পেল। ইন্দোনেশিয়া ১৯৭৬ সালে যখন তিমোর দ্বীপপুঞ্জে মুক্তিসংগ্রামী ফ্রেটিলিন"-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিপীড়ন চালালো, ইন্দোনেশিয়ার সেই নির্লজ্জ হস্তক্ষেপকে সমর্থন জানালো ইন্দিরা সরকার। এগুলি আগে কখনো ভাবা যেতো ভারত সরকারের কাছে—যে সরকার বিশ্ববাসীর সামনে প্রথম রাষ্ট্রসংঘ মঞ্চে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়, জোট-নিরপেক্ষতা নীতির সূচনা করে?

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার দশম কংগ্রেসের (১৯৭৫) রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলেছিল: 'ভারতে পুঁজিতান্ত্রিক পথ মার্কিনী নয়া উপনিবেশবাদের সামনে সুযোগ এনে দিচ্ছে।' অত্যন্ত সঠিক মন্তব্য। কিন্তু জরুরী অবস্থার মাঝে এই সত্য মনে রেখে সি. পি. আই তার রাজনৈতিক অবস্থান নিতে পারে নি। সি. পি. আই জাতীয় পরিষদের আত্মসমালোচনা এই ধারণাকে দৃঢ়সংবদ্ধ করছে। নয়া উপনিবেশবাদ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যখন তার অনুপ্রবেশ অবাধে ঘটে, তখন উৎকোচ উপঢৌকনেরও আধিক্য দেখা যায়। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ ভিয়েতনাম, থাইল্যাণ্ড, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশে আমরা দেখেছি। ভারতের সঙ্গে এইসব রাষ্ট্রের সঙ্গে অবশ্য অনেক প্রভেদ। ঐসব রাষ্ট্রগুলি ছিল পুরোপুরি নয়া উপনিবেশ। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক পথানুসরণ ভারতে নয়া-উপনিবেশবাদী প্রভাব বাড়িয়ে তুলছে। হয়ত সেইজন্যেই নানা উপসর্গও দেখা দিচ্ছে। জরুরী অবস্থার মধ্যে যে নয়া উপনিবেশবাদের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিশেষভাবে বেড়েছে, দুর্নীতি/উৎকোচ গ্রহণের বহর তার প্রমাণ বহন করে, একটি উদাহরণ দিই। গত বছরের শেষে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী "প্রগতিশীল" অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বললেন যে, চা বাগিচাগুলি জাতীয়করণ হবে না (যুগান্তর ১৪।১১।৭৬), অথচ সেই সময়ের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ বললেন যে, মালিকরাই চা বাগিচাগুলির রুগ্নতার জন্য দায়ী (ইকনমিক টাইমস ১৪।১১।৭৬)। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে

গেলাম যে, বিদেশী চা বাগিচাগুলি ৬০ কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দিয়েছে। জরুরী অবস্থার ১৯ মাসে নাকি বাণিজ্যমন্ত্রীকে ধরে চা কোম্পানীগুলি অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিল। কংগ্রেস তহবিলে কয়েক কোটি টাকা ঢোলা হয়েছিল। প্রগতিশীলতার মুখোস পরে কি ধরনের কাজকর্ম চলছিল, তা ক্রমশই প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

জনজীবনেও নেমে এসেছিল দুঃসময়। সারা ভারতজুড়ে পরিবার পরিকল্পনার নামে যা চলেছিল, তার সঙ্গে তুলনা চলে ফ্যাসিবাদী পদ্ধতির—এর মানে অবশ্য এই নয় যে, ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছিল। মূল্যবৃদ্ধিও মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল অসহনীয়। মার্চ '৭৭-এর গোড়াতেই পাইকারী মূল্যসূচকসংখ্যা ৩২৮'০-এ উঠে গিয়েছিল—ইতিপূর্বে সর্বোচ্চ ছিল ৩২৮'০ (সেপ্টেম্বর '৭৪)। তার এক বছর আগে ছিল ২৮২'৪ (নিউ এজ ৬।৩।৭৭)। অথচ গোটা জরুরী অবস্থার সময় গোয়েবলসীয় কায়দায় বলা হচ্ছিল যে, মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে আসছে এবং সেটাই নাকি জরুরী অবস্থার সার্থকতা। এর আগে নাকি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্র মূল্যবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছিল। জরুরী অবস্থার মধ্যেই তাহলে মূল্যবৃদ্ধি হল? আসলে দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, আপোষই ছিল জরুরী অবস্থার সময় কংগ্রেস সরকারের নীতিগত প্রবণতা।

প্রশ্ন হতে পারে যে, জরুরী অবস্থার সময়েই এত জনবিরোধিতা ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোকপড়া বাড়ল, একথা মনে করা সঠিক কিনা। এ প্রশ্ন অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। জরুরী অবস্থায় একটা প্রক্রিয়ার স্তরগত পরিণতি ঘটেছিল, কিন্তু সেই প্রক্রিয়া থেমে ছিল না। ১৯৭১ সালে লোকসভা মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পরেই একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধের চেয়ে কংগ্রেস সরকারের ঐক্যের দিকটিই বড়ো হয়ে ওঠে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭১ সালে তার নবম কংগ্রেসের রাজনৈতিক দলিলে ঠিকভাবেই বলেছিল যে, শাসক কংগ্রেস আবার সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছে। সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐক্যমুখিনতা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষের বিষয়গত ভিত্তি। ১৯৭১ সালের পর থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সংখ্যা ও সম্পদ দুই-ই বেড়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে ১০টি সর্ববৃহৎ একচেটিয়া গোষ্ঠীর সম্পদ ছিল ২৮০৫ কোটি টাকা, ১৯৭৫-৭৬ সালে ১০টি বৃহত্তম একচেটিয়াপুঁজিগোষ্ঠীর সম্পদ হয়েছে ৪২৩০ কোটি টাকা (ইকনমিক

এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি ১৭।১১।৭৬, ইকনমিক টাইমস, ১৪।২।৭৭)। পাঁচ বছরে এদের সম্পদ ৫০ শতাংশেরও বেশী বেড়েছে। শুধু তাই নয়। তখনকার ১৩টি আর এবারের ১৩টি এক নয়, ক্রমিক পর্যায়ের পরিবর্তন ঘটেছে। এবার মার্টিনবার্ন, বার্ড-হিলজার্স, কিলাচাঁদ তুলসীদাস, ওয়ালচাঁদ ও গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী নেই। তার বদলে এসেছে সিঙ্ঘানিয়া, শ্রীরাম, সারাভাই ও বিদেশী গোষ্ঠী প্যারি। টাটা ও বিড়লার সম্পত্তি ১৯৭০-৭১-এ ছিল যথাক্রমে ৭১১ ও ৬৮০ কোটি টাকা, এবার তা হয়েছে যথাক্রমে ১০৬৭৬ ও ২৭৪'৬ কোটি টাকা। তাছাড়া এবার ১৪টি নতুন একচেটিয়া গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে যাদের ১৯৭২-'৭৩ থেকে ১৯৭৫-৭৬এ মোট সম্পত্তি ৫১০ কোটি টাকা থেকে ৯৫০ কোটি টাকায় বেড়েছে এবং এই ১৪টির মধ্যে ১০টি হল আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনের ভারতীয় শাখা (ইকনমিক টাইমস, ১৪।২।৭৭)

শুধু তাই নয়, ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৫-৭৬ এর মধ্যে ভারতের পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে রপ্তানী ২৪'১ শতাংশ থেকে ১৭'০ শতাংশ নেমে গেছে। আমদানী কমেছে ১৪'০ শতাংশ থেকে ১০'৫ শতাংশ, (ইকনমিক টাইমস, ১।১১।৭৭), সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সব সময়েই ভারতের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতামুখিনতার সহায়ক। অথচ কংগ্রেস বিভক্তির পরে এদিকটা তুলনামূলকভাবে অবহেলিত হয়েছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে ঐতিহাসিক ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল কেন? আমি পাল্টা প্রশ্ন করছি, জনতা সরকার কেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসার করতে চাইছে—যাদের অনেকে ক্ষমতায় আসার আগে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছেন? এমনকি মোরারজী দেশাইও ভারত-সোভিয়েত চুক্তি বাতিলের কথা বলেছিলেন কলকাতায় ১৯৭৭ লোকসভা নির্বাচনী সভায়।

ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী কেন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়, সেই কারণটি যথাযথ উপলব্ধি করতে হবে। কেন জনতা সরকার এ নীতিকে বিসর্জন দিতে চাইছে না (অন্তত এখনই), সেটা ভাবতে হবে। ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী চাইছে স্বাধীন পুঁজিতান্ত্রিক পথ—অথচ সাম্রাজ্যবাদ তা অনুমোদন করছে না। ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধের ক্ষেত্র এখন এ জায়গাটাতেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাদের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে দর

কর্মাকর্মির ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার এ মর্মবস্তুকে মনে রাখতে হবে—এ সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা নয়। এ সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা স্বাধীন পুঁজিতান্ত্রিক পথে শোষণ বজায় রাখার সংগ্রাম হতে উদ্ভূত। আর জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম। কাজেই আমরা দেখি যে, একদিকে যেমন ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি হচ্ছে, তেমনই অন্য-দিকে ভারত-পূর্ব ইওরোপ বাণিজ্যের পরিমাণ কমছে।

সুতরাং জরুরী অবস্থায় যেমন জনবিরোধিতা, জনগণের উপর নিপীড়ন, দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের মিতালী বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি এ নয় যে, হঠাৎই এই প্রবণতাগুলি মাথা চাড়া দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিজয়ের পর কংগ্রেস সরকার তার শ্রেণীস্বার্থের প্রতি বিশেষ নজর দিতে থাকেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষরফার ঝোঁক বাড়তে থাকে। কেউ বললেন: তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি হল কোথা থেকে? সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষরফা বৃদ্ধি মানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা পরিত্যাগ করা নয় এবং বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাধীন পুঁজিতান্ত্রিক পথের প্রয়াসী (যার প্রতিফলন স্বাধীন বৈদেশিক নীতিতে), ততদিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধ অবলুপ্ত হবে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার মানেই প্রগতিশীলতার পথে ইতিবাচক পদক্ষেপ, এ অভিমত অতিসরলীকরণদুষ্ট। প্রথমত, রাষ্ট্রক্ষেত্র ভারতে প্রধানত পুঁজি-তান্ত্রিক পন্থকে লালিত করেছে। কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের পণ্য (যা সাধারণত মূলধনী ও ভারী-শিল্পপণ্য), যে শিল্পশাখাগুলিতে উৎপাদনী উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সে শিল্পগুলি বেসরকারী ক্ষেত্রে এবং মূলত একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজি মালিকানাধীন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের পণ্যচাহিদা এদের উপরেই নির্ভরশীল। তাছাড়া এইসব পণ্য কম দামে বিক্রি করা হয়, এ তথ্য অনেক-বারই প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে ব্যুরো অফ পাবলিক এন্টার-প্রাইজেস-এর রিপোর্টে ঐ সংস্থার তৎকালীন ডাইরেক্টর ডঃ অজিত মজুমদার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের এযাবৎ সর্বোত্তম অবস্থায় বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের আগামী দিনগুলি অনিশ্চয়তায় আবৃত। আসলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র পুঁজি-তান্ত্রিক নিয়মকে তো এড়াতে পারে না। তাছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রাধান্য-

বৃদ্ধি যদি প্রগতিশীলতার মাপকাঠি হয়, তাহলে ইরান ও দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের চেয়ে প্রগতিশীল—কারণ এ দুটি দেশের আর্থব্যবস্থার ৭০ শতাংশ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে।

আমাদের যেতে হবে গভীরে—পল্লবগ্রাহী বিশ্লেষণ নিরর্থ। যারা মনে করে এসেছেন যে, ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাধীন পুঁজিতান্ত্রিক পথানুসরণ করছেন, তাদের ভেবে দেখতে বলি যে, সাম্রাজ্যবাদের পতনপর্বের বর্তমান স্তরে তৃতীয় দুনিয়ার কোন দেশে স্বাধীন পুঁজিতান্ত্রিক পথ সম্ভব কিনা। প্রসঙ্গত, দুটি সোভিয়েত প্রবন্ধের উল্লেখ করতে চাই, একটি হল ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনাস্টিট্যুট ও একাডেমী অফ সায়েন্স, সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত Oriental Countries Today (vol I) গ্রন্থের ভূমিকায় প্রখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী লেভকোভস্কির উক্তি যে, তৃতীয় দুনিয়ায় পুঁজিতান্ত্রিক পথানুসারী দেশগুলি নয়া উপনিবেশবাদ হতে চলেছে। দ্বিতীয়টি রাচিক আভাশেভ, কিন্তা মাইদানিক ও তাতিয়ানা শোকাতায়েভা লিখিত 'Possibilities and Limits of Capitalism in the Third world' প্রবন্ধ। এতে এরা বলছেন"...Capitalism in the Third World could develop only as a dependent and subordinate component of the world economy, which it still is in many respects (Social Sciences No 4, 1974, P 161)। একথাটা এজন্যে বলছি যে, পুঁজিতান্ত্রিক পথ যতদিন আছে ততদিন নয়া উপনিবেশবাদী শোষণের বিপদ রয়েছে। এই মৌলিক উপলব্ধি না থাকলে এরকমটা বোঝানো হবে যে, জরুরী অবস্থায় যা গোলমাল হয়েছিল, না হলে সব ঠিকই ছিল। অবশ্য এ ধরনের যুক্তি বাস্তবের আঘাতে খান খান হয়ে যাবে। জরুরী অবস্থার মূল্যায়ন এজন্যেই প্রয়োজন এবং সে মূল্যায়ন হতে হবে সামগ্রিক। নচেৎ ভারতে পুঁজিতান্ত্রিক পথের মোকাবিলা করা যাবে না।

জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কী বহুশ্রেণীক রাষ্ট্র ?

জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন শ্রেণী বা শ্রেণীগুলি চূড়ান্ত শক্তি হিসাবে গণ্য হবে। এটাই হচ্ছে ভারতীয় বিপ্লবের একটি প্রধান বিষয়।

কোন কোন ভারতীয় মার্কসবাদী এই অভিমত পোষণ করেন যে, "এটা এমন রাষ্ট্র হবে যেখানে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলি দূর করতে এবং ভারতীয় একচেটিয়াদের ক্ষমতা ভেঙ্গে দিতে আগ্রহী এমন সমস্ত শ্রেণীগুলি যুক্তভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। তাই এটা হবে বহুশ্রেণীক রাষ্ট্র। যা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার কাজে ব্রতী হবে।"

অনুরূপ মতামতসম্পন্ন অপর একজন প্রবক্তা আরও ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "এর লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা যা হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকের সমস্ত অংশ, সহরের পেটিবুর্জোয়া এবং অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের যুক্ত বিপ্লবী একনায়কতন্ত্র।"

প্রসঙ্গতঃ, এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাওসে তুং তার "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র প্রসঙ্গে" শীর্ষক (১৯৪৯) প্রবন্ধে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। মাও লিখেছেন যে "শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের যুক্ত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" (Wang Ming : Lenin, Leninism and the Chinese Revolution)।

বহুশ্রেণীক রাষ্ট্রের এই ধারণা কি লেনিনবাদের তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ? এই ধারণা অনুসারে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া প্রভৃতি চারটি শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা হবে একই পর্যায়ের। এটা বলাবাহুল্য যে, বিভিন্ন শ্রেণী সমাজে যেরূপ নিজ নিজ স্থান দখল করে তার উপরই এই শ্রেণীগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ধারিত হয়। এ থেকেই এটা স্থির হয়ে যায় যে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী কৃষক প্রভৃতি শোষিত শ্রেণীর ভূমিকা বুর্জোয়া প্রভৃতি শোষক শ্রেণীর ভূমিকার সঙ্গে এক হতে পারে না। এর অর্থ হল : যে-জাতীয় বুর্জোয়ার শ্রেণীচরিত্র

দ্বৈতবাদী ও অসঙ্গতিপূর্ণ তার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীকে একই বন্ধনীমুক্ত করা যেতে পারে না।

চীনে "শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্মিলিত একনায়কতন্ত্রের" ধারণা মূলত চীন বিপ্লবে চীন শ্রমিকশ্রেণীর তত্ত্ব ও কর্মসূচীর বিপরীতে চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের তত্ত্ব ও কর্মসূচী ছাড়া কিছু নয় (ওয়াঙ মিঙ)। জাতীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের বহুশ্রেণীবিশিষ্ট ধারণা মূলতঃ এমন একটি ধারণা যা জাতীয় বুর্জোদের পক্ষে ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। এটা খুবই অদ্ভুত যে রাষ্ট্রের বহু শ্রেণীবিশিষ্ট চরিত্রকে ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এই মার্কসবাদীরা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পুরাতন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আলাদা করে দেখছেন না। তাদের কাছে এই দুই বিপ্লব একই ধরণের এবং একই অর্থ বহন করে।

বহু শ্রেণীবিশিষ্ট রাষ্ট্রের অথবা চারটি শ্রেণীর যৌথ একনায়কতন্ত্রের ধারণার অর্থ হচ্ছে যে, বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মতই বিপ্লবের একই ধরনের চালিকা শক্তি।

লেনিন বারবার এক নতুন ধাঁচের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চালিকা শক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রীর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। যখন চিচেরিন জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য অধিকতর জোর দেন এবং যখন তিনি বুর্জোয়া এবং কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তখন লেনিন তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন। চিচেরিনের ভুল ধারণা সংশোধন করতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন : "আমি কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীর উপর বেশী জোর দেই (কৃষকরা বুর্জোয়াদের মত একই ধরনের নয়)" (Lenin on the National and Colonial Question – by V. Y. Zevin. Lenin the Great Theoretician)

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়ারা চালিকা শক্তি এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত ও কৃষকরা চালিকা শক্তি—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে চালিকাশক্তি ছিল, তখন ছিল পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের যুগ। প্রলেতারিয়েত ও কৃষকরা যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চালিকা শক্তি তার কারণ এই বিপ্লব হচ্ছে পুঁজিবাদী সংকটেরই ফল। এর অর্থ হল

যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের সর্বপ্রকার শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিকাশলাভ করছে। পুঁজিবাদ বিরোধিতা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এক নতুন ধাঁচের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

যাহোক, এটা উল্লেখ করা উচিত যে ঐ একচেটিয়া বুর্জোয়াদের একাংশ শুধু, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টেই অংশগ্রহণ করবে না, জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু এর কোন ক্ষেত্রেই ঐ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের চালিকা শক্তির ভূমিকা থাকবে না। এই ভূমিকা না থাকার কারণ শুধু বিপ্লবের চরিত্রই নয়, শ্রেণীর নিজস্ব দুর্বলতা ও ভূমিকাও এর জন্য দায়ী। ফ্রন্ট এবং রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়ারা অস্থিরচিত্ত এবং দোদুল্যমান মিত্র।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অসামঞ্জস্যতা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যকে মার্কসবাদীদের অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যুক্তি উপস্থিত করে জাতীয় বুর্জোয়াকে নিরলস যোদ্ধা ও একনিষ্ঠ গণতন্ত্রী হিসাবে দাবি করা যেতে পারে না। একমাত্র প্রলেতারিয়েতই গণতন্ত্রের জন্য একনিষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে গণ্য হতে পারে। যদি বিপ্লবী সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে কৃষক জনসাধারণ যুক্ত হয় তবেই প্রলেতারিয়েত বিজয়ী যোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

কৃষক শোষণের শিকার। তথাপি তারা এক অস্থিরচিত্ত শক্তি কারণ এই শ্রেণীর সঙ্গে "যুক্ত রয়েছে এক বিরাট সংখ্যক আধা প্রলেতারীয় এবং পেটিবুর্জোয়া অংশ।" (লেনিন—দুই কৌশল)। কিন্তু লেনিন বলেছেন,— "যাহোক, কৃষক শ্রেণীর অস্থিতিচিত্ততা বুর্জোয়াদের অস্থিতিশীলতার চেয়ে মৌলিকভাবেই পৃথক কারণ বর্তমানে কৃষকশ্রেণী ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখার চেয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রধান পদ্ধতি ভূ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রেই বেশী আগ্রহী। সুতরাং সমাজতন্ত্রী না হয়েও অথবা পেটি-বুর্জোয়া থেকে বিচ্যুত না হয়েও কৃষকশ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এক ঐকান্তিক ও অত্যন্ত চরম একনিষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হতে সক্ষম।"

"উপরন্তু, কৃষকশ্রেণী শুধু আমূল কৃষি সংস্কারের সম্ভাবনার জন্যই নয় নিজস্ব সাধারণ ও স্থায়ী স্বার্থে বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হয়। এমনকি প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সংগ্রাম করেও কৃষক গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে দাঁড়ায় কারণ কেবলমাত্র একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার স্বার্থ যথাযথভাবে প্রকাশ করতে এবং

একটি প্রধান অংশ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে তাঁর প্রাধান্য সুনিশ্চিত করতে সক্ষম।" (লেনিন : দুই কৌশল)

এটা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, লেনিন তাঁর বিখ্যাত ঔপনিবেশিক থিসিসে যে আহ্বান উত্থাপন করেন তা হল : "কৃষক সোভিয়েত" অথবা "শ্রমজীবী জনগণের সোভিয়েত" অথবা "শোষিত মানুষের সোভিয়েত"। এ থেকেই বোঝা যাবে যে লেনিন কেন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মধ্যে মৈত্রীর প্রশ্নের উপর গুরুত্ব দেন।

লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকের এই মৈত্রী শোষিত শ্রেণীর বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রে পরিণত হবে এবং এ ধরনের একনায়কতন্ত্র সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে একটি অ-পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করতে সমর্থ হবে।

প্রলেতারিয়েতের সহযোগী হিসাবে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে ছোট করে দেখা এবং অসংগতিপূর্ণ বুর্জোয়াদের "দৃঢ়তা" সম্পর্কে অতি মূল্যায়ন থেকেই "বহু শ্রেণীবিশিষ্ট" রাষ্ট্র অথবা জাতীয় বুর্জোয়াসহ চার শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

পরিশেষে, বহু শ্রেণীবিশিষ্ট রাষ্ট্র অথবা চারটি শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, এ ধারণাকে চিরতরে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

—আর. দাশগুপ্ত

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

জাতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে বেশ কিছুকাল ধরেই "মূল্যায়নে" যে আলোচনা চলছে—তার মূল্য খুবই বেশী। কারণ, সুস্পষ্ট বিপ্লবী তত্ত্ব ভিন্ন বিপ্লব সম্ভব নয়, এবং আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র কর্মসূচী উপস্থিত করলেও জাতীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক ধারণা একান্ত বিরল।

এই অস্পষ্টতা নিতান্ত অকারণ নয়। প্রথমত, জাতীয় গণতন্ত্রের ধারণা নতুন না হলেও কর্মসূচীগত আশু লক্ষ্য হিসাবে তা অনেকটা নতুন। স্বভাবতই তা এখনো পরীক্ষার পর্যায়ে আছে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় গণতন্ত্রের ধারণাটি অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে জড়িত। যে সকল দেশে ধনতন্ত্র বিকশিত হয়ে ওঠে নি, সে-সব দেশে পুঁজিবাদী পথ পরিহার করে একটি মধ্যবর্তী স্তর অতিক্রমের কথা উঠছে। এই স্তরে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্কসমূহের অবসান ঘটবে, শিল্পায়ন হবে এবং সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্তগুলি গড়ে উঠবে,—কিন্তু, তা ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ঘটবে না। এই পথটিকে বলা হয়েছে অ-ধনতান্ত্রিক পথ, এবং এই বিপ্লবের নাম হল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ধনতন্ত্রের বিকাশ না হওয়ার ফলে এই বিপ্লবের সুরুতে বুর্জোয়া এবং শ্রমিক কারুরই বিকাশ ঘটে নি, এবং ফলত, এই বিপ্লবের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী আসতে অসমর্থ হবে। অবশ্যই আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীকে, বিশেষত বিজয়ী শ্রমিক পার্টিসমূহকে এই বিপ্লবের বন্ধু ও নেতা হিসাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বলাই বাহুল্য ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জাতীয় গণতন্ত্র বা অ ধনতান্ত্রিক পথের উপরোক্ত ছকটি খাটে না।

ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে, এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে তার স্থান একেবারে প্রথম সারিতে। স্বভাবতই "ধনতন্ত্রকে এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে যাওয়ার" প্রশ্নটি এখানে আর ওঠে না। বুর্জোয়া এবং শ্রমিক, উভয়েই ভারতবর্ষে যথা পরিমাণে বিকশিত। ফলে অন্য পশ্চাৎপদ দেশের

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বের চেহারার সঙ্গে এ দেশের নেতৃত্বের চেহারাও হবে আলাদা। আমাদের দেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক ও বুর্জোয়ার ভূমিকা তাই অনন্য, এবং অন্য দেশের দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে অবান্তর।

বিষয়টি এ-সকল কারণে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, এবং "মূল্যায়ন" তাতে মূল্যবান অবদান রাখছে।

দুই

এই বিতর্কে "মূল্যায়নে সর্বশেষ প্রবন্ধটি গত শারদীয় সংখ্যায় অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ "আলোচনার জন্য" লিখেছেন। একজন পাঠক হিসাবে সেই আলোচনায় কিঞ্চিৎ অংশগ্রহণের জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

অধ্যাপক কবিরাজের প্রবন্ধটিকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার একটি অসুবিধা আছে। তিনি যাঁদের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে চান সেই "পূর্বপক্ষের" যুক্তিগুলিকে তাঁর প্রবন্ধে যথাযথভাবে উপস্থিত করা হয় নি। প্রথমত, তিনি "এক শ্রেণীর তাত্ত্বিকে"র বক্তব্য বলে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন, লেখকের কোন নাম, সূত্র, বা প্রসঙ্গ উল্লেখ না থাকায় সেগুলি এতই বিচ্ছিন্ন যে কোন পাঠকের পক্ষে এই সব "তাত্ত্বিকে"র বক্তব্যের বিচার করা দুরূহ। দ্বিতীয়ত, এমনকি তাঁর প্রবন্ধের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি থেকেও দেখা যায় যে পূর্বপক্ষের বক্তব্য উপস্থাপনায় তিনি তাঁদের প্রতি সুবিচার করেন নি। অনেক জায়গায় তিনি তাঁদের মুখে মনগড়া কথা বসিয়ে তার সমালোচনা করেছেন। দুটি উদাহরণ দিলে সম্ভবত যথেষ্ট হবে।

প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, এক শ্রেণীর তাত্ত্বিক বলতে চান ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় গণতন্ত্র···হবে 'শ্রমিকশ্রেণী, সকল স্তরের কৃষক, সহরে পেটিবুর্জোয়া এবং অ-একচেটিয়া স্তরের বুর্জোয়াদের যৌথ বৈপ্লবিক একনায়কত্ব।' এটাই নাকি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য।'' (১৯২ পৃঃ দ্রঃ)

এই উদ্ধৃতির ভাষ্য করে অধ্যাপক কবিরাজ বলেন, এই মত অনুযায়ী "বিপ্লবী শক্তি হিসাবে শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়ারা তুল্যমূল্য।'' (১৯২-৯৩ পৃঃ) কিন্তু এই ব্যাখ্যা কি সঙ্গত? "যৌথ বৈপ্লবিক একনায়কত্বে'' সকলেই তুল্যমূল্য হবে এমনকি কোন কথা আছে? অধ্যাপক

কবিরাজ যে "শ্রমিক-কৃষক যৌথ একনায়কত্বের কথা বলেছেন, তার থেকে কি মানে দাঁড়াবে যে শ্রমিক ও কৃষক "বিপ্লবী শক্তি হিসাবে তুল্যমূল্য ?"

অধ্যাপক কবিরাজ আর একটু এগিয়ে এই ভ্রান্ত থেকেও সরে এসেছেন, এবং বলছেন "এই তত্ত্ব অনুযায়ী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে কৃষকদের স্থান নেই। তাদের স্থান শুধু মাত্র ফ্রন্টে।" (পৃঃ ১২৪) কৃষক ও জাতীয় বুর্জোয়ারা "তুল্যমূল্য" হলে এই পার্থক্যের প্রশ্নটি কোথায় উঠল ? অন্তত, উদ্ধৃতিগুলি থেকে তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় উদাহরণ, অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে। প্রবন্ধে আছে : "একজন তাত্ত্বিক···বলছেন···'এই পথকে অ-পুঁজিবাদী বলা হয় কারণ যে, পুঁজিবাদী পথে একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টি হয় এটা সেই পথ নয়।' এই কথার একটিই অর্থ হয় : অ-ধনতান্ত্রিক পথ একচেটিয়া ধনতন্ত্রবিরোধী, সমগ্রভাবে ধনতন্ত্রবিরোধী নয়।" (১২৫ পৃঃ)

কিন্তু, বিচ্ছিন্নভাবে বলা হলে ঐ একটি লাইনের কি এই "একটিই অর্থ" হয় ? যদি উদ্ধৃত বাক্যটুকুতে "একচেটিয়া পুঁজি" কথাটিকে পাল্টে কেউ বলেন, "এই পথকে অ-পুঁজিবাদী বলা হয়, কারণ যে পুঁজিবাদী পথে অনাহার ও বেকারিত্বের সৃষ্টি হয়, এটা সেই পথ নয়,"—তাহলে তাতে কি অধ্যাপক কবিরাজ আপত্তির কিছু দেখতে পাবেন ? কিন্তু, তাহলে কি তার "একটিই অর্থ" দাঁড়াবে যে অ-ধনতান্ত্রিক পথ "অনাহার ও বেকারিত্ব বিরোধী", সমগ্র-ভাবে "ধনতন্ত্রবিরোধী" নয় ?

এ জাতীয় ব্যাখ্যা আমাদের আলোচনার পক্ষে খুব সহায়ক হবে না। আমরা তাই অধ্যাপক কবিরাজের প্রতিপক্ষের বক্তব্যের ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

তিন

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন স্তরে শ্রমিক ও জাতীয় বুর্জোয়ার কোন অংশের যৌথ নেতৃত্বের কোন সম্ভাবনা অধ্যাপক কবিরাজ বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বুর্জোয়ারা যেহেতু কখনোই ধনতন্ত্রের বিরোধী শক্তি নয়, তারা তাই ধনতন্ত্র বিলোপের এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে নেতৃত্ব দেবে এটা "অ-স্বাভাবিক ও অকল্পনীয়।" তিনি এই যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে "শ্রমিক কৃষক বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের" কথা বলেছেন। কিন্তু

এই যুক্তি সঠিক হলে প্রশ্ন ওঠে, ধনতন্ত্র বিলোপের এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে কৃষকশ্রেণী নেতৃত্ব দেবে, এটাও কি "অ-স্বাভাবিক ও অকল্পনীয়" নয় ?

কৃষক শ্রেণী যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাভাবিক মিত্র, এবং "কৃষক আর বুর্জোয়ারা যে কিছুতেই এক বস্তু নয়"—মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর কাছে এটা এখন স্বতঃসিদ্ধ এবং লেনিন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তা "প্রমাণ" করার প্রয়োজন যদি আজও থেকে থাকে, তবে তা দুর্ভাগ্যজনক। অধ্যাপক কবিরাজ এ সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু, কৃষকশ্রেণীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে লেনিনের ধারণা কি, সম্ভবত বর্তমান আলোচনায় সেটাই বেশী প্রাসঙ্গিক। কারণ, তর্কটা কোন্ কোন্ শ্রেণী মিত্র তা নিয়ে ততটা নয়, যতটা নেতৃত্ব নিয়ে।

"তৃতীয় আন্তর্জাতিকে"র তৃতীয় কংগ্রেসে রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশল সম্পর্কিত রিপোর্টে ("Report on the tactics of the R.C.P." —July 5, 1921) লেনিন বলেন : মেনশেভিকরা বলে থাকে কৃষকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, অতএব গণতন্ত্রসম্মতভাবে তাদেরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার। কিন্তু, বাস্তবে কৃষকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ হল "পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবন ভিন্ন কিছুই নয়।" অতএব কৃষকের নেতৃত্ব পুঁজিবাদবিরোধী—এ ধরনের ধারণা ভুল।

লেনিন তার দেশে কালে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে দেখেছিলেন। শ্রমিক-কৃষক যৌথ একনায়কত্বের কথাটি তখন ওঠে নি। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্কযুক্ত ঔপনিবেশিক দেশসমূহে অ-ধনতান্ত্রিক পথে সমাজবিপ্লবের কথা লেনিনই উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু, তাতেও তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষত বিজয়ী শ্রমিক-রাষ্ট্রের নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের কথা যতখানি জোর দিয়ে বলেছিলেন, অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ততখানি স্পষ্টতার মধ্যে না গিয়ে তাকে ভবিষ্যতের জন্য উহ্য রেখেছিলেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে সেই বিখ্যাত Report of the Commisson on the National and Colonial Questions-এই (July 26, 1920) লেনিন এই পথ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে "কোন্ উপায়ে তা সম্পন্ন হবে আগে থেকেই তা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তা স্থির করা যাবে।"

অতএব, বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা না বলে শুধুমাত্র লেনিন থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে ভারতবর্ষে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্বের প্রশ্নে কোন মীমাংসায়

আসা সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে লেনিন উত্তরকালের সৃজনশীল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপরই নির্ভর করেছিলেন, কোন আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেন নি।

চার

এই প্রসঙ্গে অ-ধনতান্ত্রিক পথের প্রকৃতি নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অ-ধনতান্ত্রিক পথ কি একটি তৃতীয় পথ? তৃতীয় পথ বলতে কি বোঝায়? ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে থাকাই কি তৃতীয় পথ? এমনকি ধনতন্ত্রের পূজারীরাও যখন আজকাল "সমাজতন্ত্রে উত্তরণে"র কথা না বলে পারে না, তখন কোন মার্কসবাদীর পক্ষে কি এই ধরনের এক কাল্পনিক সমাজের কথা ভাবা সম্ভব, যেখানে একচেটিয়া পুঁজি থাকবে না, সমাজতন্ত্রের দিকে সে এগোবে না, থাকবে শুধু অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্র? এ ধরনের কল্পনাবিলাসীরা সুখে থাকুন, তাঁদের সাথে তর্ক করা বৃথা। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কর্তৃক অ-ধনতান্ত্রিক পথের উদ্বোধন হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে সমাজতন্ত্রে কায়েম করার দিকে পদক্ষেপ। বলা হয়েছে যে অ-ধনতান্ত্রিক পথে "শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হবে।" ("কর্মসূচীর" ৮২ নং অনুচ্ছেদ)

অতএব, অ-ধনতন্ত্রের পথ প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রের অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের অবলুপ্তির পথ। কিন্তু, তার মানে কি এই যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুরুতেই যে-কোন প্রকার ধনতন্ত্র গড়ে তোলার স্বাধীনতা কেড়ে নেবে? অধ্যাপক কবিরাজ এই মত পোষণ করেন, এবং "অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ানের স্বার্থে এক ধরনের ধনতন্ত্র (অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্র) গড়ে তোলার স্বাধীনতা" দেওয়ার প্রস্তাবকে সংশোধনবাদী বলে বাতিল করে দেন। (শা মূল্যায়ন, ১২৫ পৃঃ)

কিন্তু, লেনিনের নেতৃত্বে "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের" অভিজ্ঞতা কি বলে? বিপ্লবের তিন বৎসর পর "নতুন অর্থনীতি" বা New Economic Policy-র সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন বলেন: "ফসলে ট্যাক্স পরিশোধ করার পর যা উদ্বৃত্ত ফসল থাকবে কৃষকদের তা স্বাধীনভাবে বিনিময় করার স্বাধীনতা থাকবে। বিনিময়ের এই স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ায় পুঁজিবাদের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার মানে হল পুঁজিবাদের স্বাধীনতা, কিন্তু, তার আরো মানে হল **এক নতুন ধরনের পুঁজিবাদ**। এর মানে দাঁড়ায়, খানিকটা পরিমাণে, আমরা নতুন করে পুঁজিবাদ সৃষ্টি করছি। ...এ হল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। কিন্তু, পুঁজি যেখানে ক্ষমতাসীন সেই সমাজে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, এবং সর্বহারা-শ্রেণীর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ **দুটি স্বতন্ত্র বিষয়**।" (Report on the tactics of the R.C.P'-ঐ—বড় হরফ বর্তমান লেখকের)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অধ্যাপক কবিরাজ যদিও জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে "এক ধরনের ধনতন্ত্র গড়ে তোলার স্বাধীনতা" দিতে চান না, লেনিন এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও "এক ধরনের ধনতন্ত্র গড়ে তোলার" স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ধনতন্ত্র গড়ে উঠলেই সমাজতন্ত্রমুখীনতা নষ্ট হয় না। দেখতে হবে কোন রাষ্ট্রে তা হচ্ছে। যে রাষ্ট্রে বুর্জোয়ারা একচেটিয়া ক্ষমতাসীন এবং যে রাষ্ট্রে তাদের ক্ষমতা খণ্ডিত এই দুই ধরনের রাষ্ট্রে পুঁজিবাদ অবশ্যই "দুটি স্বতন্ত্র বিষয়" হয়ে দাঁড়াবে। এই পার্থক্য স্মরণে না রাখলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ডায়েলেকটিক্স্ বোঝা যাবে না।

পাঁচ

ভারতবর্ষে বিপ্লবের বর্তমান স্তরে আশু লক্ষ্য কি? লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজির বিলোপ সাধন। সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের বিলোপ সাধন আমাদের আশু লক্ষ্য হবার মত বাস্তব অবস্থা নেই, কারণ, এ-দেশে শ্রমিকশ্রেণী এখনও দুর্বল, এবং এর এক বড় অংশ এখনো বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই পুঁজিবাদের বিলোপ ঘটতে পারে, অধ্যাপক কবিরাজের মত অনুযায়ী শ্রমিক-কৃষকের যৌথ নেতৃত্বে কখনো নয়। কৃষকশ্রেণীকে বুর্জোয়া নেতৃত্ব থেকে শ্রমিক নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসাটাই ধনতন্ত্র বিলোপের পূর্বশর্ত।

ধনতন্ত্র বিলোপ তাই ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর **আশু লক্ষ্য** নয়, আশু লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, একচেটিয়া পুঁজির বিলোপ সাধন। এই লক্ষ্য সাধনে শোষিত শ্রেণীসমূহের সঙ্গে বুর্জোয়াদের অ-একচেটিয়া অংশও সামিল হবে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের কবলমুক্ত হয়ে দেশের উন্নয়নে বাস্তব স্বার্থ থাকায়, এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে এটা ঘটবে।

এই অ-একচেটিয়া ধনিকশ্রেণী বর্তমানে কি অবস্থায় আছে? কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমগ্র জাতীয় বুর্জোয়ার একনায়কত্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একচেটিয়া এবং অ-একচেটিয়া সকল প্রকার ধনিকরাই এই একনায়কত্বের অংশীদার। সি. পি. এম. ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বৃহৎ বুর্জোয়া ও জমিদারদের একনায়কত্ব বলে মনে করে। কিন্তু, তাতে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি ও স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াসকে ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যাপক কবিরাজও এ-বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়নকেই স্বীকার করে নেন।

তা হলেই প্রশ্ন আসে, যে অ-একচেটিয়া ধনিকশ্রেণী বর্তমানে রাষ্ট্রব্যবস্থার একনায়কত্বের অংশীদার তারা কি তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করবে? বুর্জোয়ারা বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে নেবে; **এ ধরনের ধারণাকে অধ্যাপক কবিরাজ তাঁর প্রবন্ধের শেষাংশে উপহাস করেছেন। অথচ, তাহলে এদেশে বুর্জোয়ারা কেন অ-বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব মেনে নেবে, সে প্রশ্নের তিনি জবাব দেন নি।** যে অ-একচেটিয়া ধনিকরা বর্তমানে রাষ্ট্রযন্ত্রের নেতৃত্বে অবস্থিত, তাদেরকে নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করাই যদি "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের" আশু লক্ষ্য হয়, তাহলে তো বলপ্রয়োগের দ্বারাই তা করতে হবে, এবং তাহলে তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর মিত্র বা সহযোগী হবে কিভাবে? অথচ, এই স্ববিরোধী কথাটাই অধ্যাপক কবিরাজ তাঁর প্রবন্ধে প্রমাণ করতে চান।

অ একচেটিয়া ধনিকরা যদি নেতৃত্ব হারাবার মত দুর্বল অবস্থানে চলে আসে, তাহলে কৃষকশ্রেণীর ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কায়েমের অবস্থা আসবে, এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সে বিপ্লব "জাতীয় গণতন্ত্র" নয় "জনগণ তান্ত্রিক বিপ্লবে"র চরিত্র অর্জন করবে। ভারতবর্ষে তাই "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে"র কোন ছক অ-একচেটিয়া দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াগণের নেতৃত্ব-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কিন্তু, তাই বলে বুর্জোয়ারা ধনতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করে অ-ধনতন্ত্রের পথে সচেতন নেতৃত্ব দেবে, তাই বা কিরূপে সম্ভব? অধ্যাপক কবিরাজ সহজভাবেই তাঁদের বিদ্রূপ করেছেন, যাঁরা মনে করেছেন যে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে অ-ধনতান্ত্রিক পথের উদ্বোধন হবে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে

খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণীই "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সচেতন উদ্যোগী ও নির্মাতা" (৮০ নং অনুচ্ছেদ) এবং "শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী হবে এই ফ্রন্টের ভিত্তি এবং মূল স্তম্ভ।" (৭৮ নং অনু)

লক্ষণীয় যে এই ফ্রন্টে শ্রমিক ও কৃষক "তুল্যমূল্য" নয়, এবং স্মরণ রাখা দরকার যে কৃষকের মধ্যেও ধনীকৃষক থেকে সুরু করে ক্ষেতমজুর পর্যন্ত সকলেই কখনো "তুল্যমূল্য" হতে পারে না। সুতরাং এ-সব প্রশ্ন না তুলে এটা বলাই যথেষ্ট, অবস্থার চাপে বুদ্ধিজীবীরা এবং একচেটিয়া বাদে অন্যান্য ধনিকরাও আসবেন, এবং বিপ্লবে নেতৃত্বকারীরাই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন উদ্যোগে (অর্থাৎ নেতৃত্বে) এই যে ফ্রন্ট গড়ে উঠবে, তা রাষ্ট্রযন্ত্রের নেতৃত্ব থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অপসারিত করবে, এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবকে বিনষ্ট করবে। স্বভাবতই এই যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হবে তাতে ফ্রন্টভুক্ত দেশপ্রেমিক অ একচেটিয়া বুর্জোয়ার বর্তমান নেতৃত্বমূলক অবস্থান থেকেই যাবে। সন্দেহ নেই যে, বিপ্লবের সবচেয়ে সচেতন সংগঠক শ্রমিকশ্রেণী এবং তার নিকটতম মিত্র কৃষকের সঙ্গে বুর্জোয়ারা কখনো তুল্যমূল্য হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বিপ্লবের নেতৃত্ব আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নেতৃত্ব এক নাও হতে পারে। ফ্রান্সে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, কিংবা রাশিয়ার ১৯০৫-এর বিপ্লব এবং ১৯১৭-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী কম অথবা বেশী পরিমাণে নেতৃত্বে থাকলেও রাষ্ট্রীয় একনায়কত্বে পৌঁছাতে পারে নি। ভারতবর্ষের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকলেও রাষ্ট্রীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেনা। বাস্তব সীমাবদ্ধতাই এর কারণ। ইতিহাসের এই বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এই বাস্তবতা অন্য এক সমস্যার সৃষ্টি করে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ভিন্ন সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাহলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কি ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে? এই সমাজব্যবস্থার নাম অ-ধনতান্ত্রিক পথ। এটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা। এর লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র। কিন্তু, আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অ-ধনতান্ত্রিক পথ এ-সম্পর্কিত ক্লাসিক্যাল ধারণার সঙ্গে সমার্থক নয়। ধনতন্ত্রকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থে অ-ধনতান্ত্রিক পথ এটা নয়, তা হতেও পারে না। কারণ, ভারতবর্ষে ধনতন্ত্র যথেষ্ট বিকশিত, এবং এখানে দেশীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র

যথেষ্ট শিকড় গেড়ে ফেলেছে। তাহলে একে অ-ধনতান্ত্রিক বলার অর্থ কি? অর্থ একটাই হতে পারে, তা হল ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে ছেদ টেনে দেওয়া। ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি একচেটিয়া পুঁজি। প্রথমেই সেটিকে খর্ব ও ক্রমে নির্মূল করতে হবে। এই কর্মপদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সহায়তা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিস্তার—দুটি প্রধান উপাদান হবে। এই প্রক্রিয়ায় ধনতন্ত্র ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়বে, এবং ফলে ক্রমশ ধনিকশ্রেণীর চেয়ে শ্রমিকশ্রেণী অধিকতর বলশালী হয়ে উঠবে। শ্রমিকশ্রেণী ক্রমেই একক নেতৃত্বের অবস্থায় চলে আসবে। শ্রমিক ও ধনিকের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তা ঘটবে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই ডায়েলেকটিক্স না বোঝা গেলে নেতৃত্বের প্রশ্নে সংশয় দূরীভূত হবে না।

প্রদীপ দাশগুপ্ত

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

গত "শারদীয় মূল্যায়নে" প্রকাশিত শ্রীনরহরি কবিরাজের প্রবন্ধের জবাব হিসেবে শ্রীপ্রদীপ দাশগুপ্ত যে আলোচনা করেছেন, তারজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। গত কয়েক বছর ধরে "মূল্যায়ন" জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে যেসব আলোচনা চালিয়ে আসছে, সেই আলোচনায় শ্রীপ্রদীপ দাশগুপ্ত বেশ কয়েকবার অংশগ্রহণ করেছেন। আলোচনার প্রয়োজন—তবে নিছক আলোচনার জন্য নয়; মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত একটা সঠিক ধারনায় পৌঁছাবার জন্যই এই আলোচনা।

শ্রীনরহরি কবিরাজ তাঁর প্রবন্ধে যেসব ভ্রান্ত সংশোধনবাদী ধারণাকে খণ্ডন করেছেন, তাতে শ্রীদাশগুপ্ত উষ্মা প্রকাশ করেছেন। শ্রীদাশগুপ্ত বলেছেন যে, নরহরিবাবু "পূর্ব পক্ষের" মুখে মনগড়া কথা বসিয়ে তার সমালোচনা করেছেন। শ্রীদাশগুপ্ত ভাল করে জানেন যে, ওসব বক্তব্য নরহরিবাবুর মনগড়া কথা নয়; ঐসব বক্তব্য আমাদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীদাশগুপ্তের পক্ষে ক্ষুব্ধ হবারই কথা; কারণ বাস্তব ঘটনা তাদের বক্তব্যকে বারবার নাকচ করে দিচ্ছে।

শ্রীদাশগুপ্ত অনেক কথা লিখেছেন; তাঁর সব বক্তব্য নিয়ে আলোচনা না করে, বরং তাঁর মূল বক্তব্যগুলো নিয়ে আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত।

(১) শ্রীদাশগুপ্তের মতে, ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঠিক অর্থ হচ্ছে শ্রমিক ও বুর্জোয়ার যৌথ নেতৃত্ব ও যৌথ একনায়কত্ব। তিনি মনে করেন যে, নবগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে যে, প্রথমটি ঘটবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও দ্বিতীয়টি ঘটবে শ্রমিক ও জাতীয় বুর্জোয়ার যৌথ নেতৃত্বে; অর্থাৎ, তাঁর কাছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে দুই ধরনের নেতৃত্ব হতে পারে—হয় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, না হয় শ্রমিক ও জাতীয় বুর্জোয়ার যৌথ নেতৃত্ব। তিনি বলেছেন:

"অ-একচেটিয়া ধনিকরা যদি নেতৃত্ব হারাবার মতো দুর্বল অবস্থানে চলে

আসে, তাহলে কৃষকশ্রেণীর ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েমের অবস্থা আসবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সে বিপ্লব 'জাতীয় গণতন্ত্র' নয় 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র চরিত্র অর্জন করবে। ভারতবর্ষে তাই 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র কোন ছক অ-একচেটিয়া দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াগণের নেতৃত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।"

এই বক্তব্য থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে তাঁর মতে ভারতবর্ষে যেহেতু জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয়, সেহেতু ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক বিপ্লব হবে পুরোন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই রকমফের। তাঁর এই ধারণা নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কিত লেনিনের ধারণার বিরোধী। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের চরিত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এক নতুন চরিত্র অর্জন করেছে এই দিক থেকে যে, এই বিপ্লবের কেন্দ্রে অবস্থান করছে শ্রমিক ও কৃষক। পুরোন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কেন্দ্রে অবস্থান করত বুর্জোয়াশ্রেণী, কারণ তখন যুগটা ছিল সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের যুগ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুগে যখন পুঁজিবাদ আর ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, তখন যেহেতু এই বিপ্লব ঘটছে, সেহেতু শ্রমিক ও কৃষকই এই বিপ্লবের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে। এবং এর ফলে, এই বিপ্লব সামাজিক-অর্থনৈতিক মর্মবস্তুর দিক থেকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হলেও, এই বিপ্লব বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এই বিপ্লব এই চৌহদ্দী ছাড়িয়ে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পরিচালিত হয়। শ্রমিক-কৃষক এই বিপ্লবের পরিচালক শক্তি বলে, এই বিপ্লব সুসঙ্গত ও সুসম্পূর্ণ হয় ও মাঝপথে থেমে থাকে না। সুতরাং এই বিপ্লবকে বলা হয় বিপ্লবী গণতন্ত্র। লেনিনের এই বক্তব্য বর্তমান যুগে অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে আরো সত্য হয়ে উঠছে। অবশ্য, এটা ঠিক যে সব ক্ষেত্রেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অপরিহার্য পূর্বশর্ত নয়। যেসব নিপীড়িত দেশে শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব দেবার মতো অবস্থায় নেই, সেখানে অ-শোষক শ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াদের (অর্থাৎ শ্রমজীবী জনগণ) নেতৃত্ব হচ্ছে জরুরী। কারণ, এই শ্রেণীগুলো গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করে ও তাকে সম্পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়। অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রমিকশ্রেণীকে ক্রমশ

নেতৃত্বের ভূমিকায় উন্নীত হতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী যত বেশী নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করবে, তত গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের পথ প্রশস্ত হবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীদাশগুপ্ত প্রশ্ন করেছেন "....ধনতন্ত্র বিলোপের এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে কৃষকশ্রেণী নেতৃত্ব দেবে, এটাও কি অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয় নয়"? শ্রীদাশগুপ্ত এই প্রশ্নটি করেছেন আন্তর্জাতিক পটভূমিকে বিচারের মধ্যে না রেখে। আমাদের মতো নিপীড়িত দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান উপাদান হচ্ছে কৃষক গণতন্ত্রের উপাদান। যেহেতু কৃষকরাই হচ্ছে নির্যাতিত জনগণের এক ব্যাপক অংশ, সেহেতু এই গণতন্ত্র হচ্ছে নির্যাতিত জনগণের গণতন্ত্র। কিন্তু কৃষকরা হচ্ছে পেটিবুর্জোয়া শক্তি, কারণ তারা পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি। সুতরাং, তারা সবসময় বামমুখী অবস্থান নাও নিতে পারে। এক্ষেত্রে, কৃষক আন্দোলনকে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিণত করতে হলে সচেতন শ্রমিক আন্দোলনের সাথে কৃষক আন্দোলনের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। যেসব দেশে শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠে নি বা গড়ে উঠলেও শ্রমিক আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল, সেসব দেশে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের সাথে নিপীড়িত দেশের কৃষক আন্দোলনের মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই জাতীয় কৃষক আন্দোলন বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হবে। এ প্রসঙ্গে, মনে রাখতে হবে যে এই সব দেশে কৃষক আন্দোলন মানে নিপীড়িত জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।

লেনিন নিপীড়িত দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই প্রধান ধারার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেছেন যে, এই সব দেশে কৃষক সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কৃষক সোভিয়েত হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের একটি রূপ।

সুতরাং, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃষক আন্দোলন কখনো বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের চরিত্র অর্জন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটি উহ্য রেখে কৃষকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটি বিচার করা যায় না।

তাহলে, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর কি কোন ভূমিকাই নেই? নিপীড়িত

দেশের জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী ভূমিকা আছে। এই কারণেই, এরাও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম শক্তি, যদিও পরিচালক শক্তি নয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রধানত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই অর্থে যে, এই বিপ্লবের আশু লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন ; অতএব সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী শক্তি হিসেবে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকাকে অস্বীকার করাটা হবে ভুল। কিন্তু যেহেতু জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, এবং তা ক্রমশ পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়, সেহেতু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এই বিপ্লবের পরিচালক শক্তি হতে পারে না। কারণ তার লক্ষ্য হচ্ছে এই সংগ্রামকে ধনতন্ত্রের চৌহদ্দীর মধ্যে আটকে রাখা। ফলে, সে এই বিপ্লবের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকলে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কখনো সুসঙ্গত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করতে পারে না।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ও স্বাধীনতা উত্তর কালেও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সুসঙ্গত রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যখনই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিপীড়িত মানুষের ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে, তখনই সে এই আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেছে ; কারণ, সে জানে শেষপর্যন্ত দৃঢ় ও সুসঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন তার শ্রেণী শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। তা সত্ত্বেও জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও একচেটিয়াপুঁজি বিরোধী ভূমিকাকে ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু, তা বলে, তাকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বমূলক শক্তি হিসেবে বিচার করলে তার ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখা হয় ও তাকে শ্রমিক ও কৃষকের সাথে এক পর্যায়ে স্থাপন করা হয়। ফলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে যায়।

(২) শ্রীদাশগুপ্ত মনে করেন যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে রাষ্ট্রের রূপ হবে শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের যৌথ একনায়কত্ব। তার মতে শ্রমিক ও বুর্জোয়া বিপ্লবী শক্তি হিসেবে তুল্যমূল্য না হলেও অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াদের সাথে বৈপ্লবিক গণ-তান্ত্রিক একনায়কত্বের অংশীদার হবে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, যদি শ্রমিক কৃষক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে তুল্যমূল্য না হয়েও বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক

একনায়কত্বের অংশীদার হয়, তাহলে বুর্জোয়ারাই বা হবে না কেন। তিনি বলেছেন যে, "যৌথ বৈপ্লবিক একনায়কত্বে সকলেই তুল্যমূল্য হবে এমনকি কোন কথা আছে? অধ্যাপক কবিরাজ যে শ্রমিক-কৃষক যৌথ একনায়কত্বের কথা বলেছেন, তার থেকে কি মানে দাঁড়াবে যে শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে তুল্যমূল্য?"

প্রথমতঃ, শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ধারণা অধ্যাপক কবিরাজের মনগড়া ধারণা হয়। এটা লেনিনবাদী ধারণা। লেনিন নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাষ্ট্রক্ষমতার চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ধারণা তুলে ধরেছিলেন। এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের একটা প্রধান শর্ত এবং এই উত্তরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে রূপান্তরিত হবে। সুতরাং, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক এক নায়কত্বের তারাই হবে অংশীদার, যারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সুসম্পূর্ণ করতে আগ্রহী। এটা ঠিক যে, শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে তুল্যমূল্য নয়। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে পার্থক্য এবং শ্রমিক ও বুর্জোয়াদের মধ্যে পার্থক্য এক নয়। শ্রমিক ও কৃষক পরস্পর অবৈর (non-antagonistic) শ্রেণী; আর শ্রমিক ও বুর্জোয়া হচ্ছে পরস্পর বৈর (antagonistic) শ্রেণী। সুতরাং, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ও শ্রমিক-বুর্জোয়ার মৈত্রী এক নয়। কৃষক হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাভাবিক মিত্র। আর, বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবে দোদুল্যমান শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বস্ত ও স্বাভাবিক মিত্র নয়। সুতরাং, বুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর স্থায়ী মৈত্রী গড়ে উঠতে পারে না। গণতান্ত্রিক বিপ্লব যত এগোতে থাকে এবং সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার স্তর থেকে এই বিপ্লব যত পুঁজিবাদ বিরোধিতার স্তরে উন্নীত হতে থাকে, তত শ্রমিক ও বুর্জোয়াদের মধ্যে সংঘাত বাড়ে এবং বুর্জোয়ারা এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ায়।

এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন যে বুর্জোয়াদের স্বার্থে এই বিপ্লব কখনো সুসঙ্গত, সম্পূর্ণ ও দৃঢ় হয় না। তিনি আরো বলেছেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়াশ্রেণী যে স্থানটি দখল করে আছে সেই স্থানই তাকে

প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসেবে যে স্থান দখল করে আছে, সেটাই তাদের সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক হতে বাধ্য করে। যে গণতান্ত্রিক প্রগতি প্রলেতারিয়েতকে শক্তিশালী করে, তার ভয়েই বুর্জোয়ারা পিছন ফিরে তাকায় (লেনিন : গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোস্যাল ডেমোক্রাসীর দুই কৌশল)। সুতরাং, যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভীত, সে কী করে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অংশীদার হতে পারে ?

অন্যদিকে, কৃষক হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বাহক ; কারণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জোয়াল থেকে তার মুক্তির প্রশ্নটি জড়িত। নিজের শ্রেণীস্বার্থেই সে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সুসম্পূর্ণ করতে আগ্রহী। এবং যেহেতু, শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পদক্ষেপ হিসেবে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে, সেহেতু কৃষকরা তাদের মধ্যে তাদের বিশ্বস্ত মিত্রকে খুঁজে পায়। এটা ঠিক যে, কৃষকরা পেটিবুর্জোয়া শক্তি এবং এদের মধ্যে দোদুল্যমানতা আছে। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের ব্যাপারে এদের আগ্রহ অনেক বেশী। তাই এরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণীর সাথে শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী। লেনিন বলেছেন যে, গণতন্ত্রের প্রশ্নে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে "একক ইচ্ছা" (single will) থাকে। কিন্তু গণতান্ত্রিকতার সীমানা পেরিয়ে গেলে তাদের এই "একক ইচ্ছা"র মধ্যে ভাঙ্গন ধরে এবং কৃষকদের মধ্যে বুর্জোয়া অংশ শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে চলে যায়। এবং এদের দরিদ্র ও সর্বহারা অংশ ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নতুন মৈত্রী গড়ে ওঠে। অতএব, শ্রমিক ও বুর্জোয়াদের মৈত্রী এবং শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। লেনিন নিজেই বলেছেন যে, একদিকে শ্রমজীবী ও শোষিতশ্রেণী এবং অন্যদিকে বুর্জোয়াদের মধ্যে মৈত্রী কখনো "সৎ কোয়ালিশন" হতে পারে না ; কারণ এই সব শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

শ্রীদাশগুপ্ত বুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণী-গুলোর এই পার্থক্যটা বোঝেন না বলেই শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ধারণার বিপরীতে শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের যৌথ একনায়কত্বের ধারণাটি আঁকড়ে ধরেছেন।

(৩) জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে অ-ধনতান্ত্রিক পথের প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাস্তবিকভাবেই শ্রীদাশগুপ্তের আলোচনার মূল

অ-ধনতান্ত্রিক পথের বিষয়টি এসে পড়েছে। এখানেও, তিনি অ-ধনতান্ত্রিক পথের সংশোধনবাদী ধারণার একজন গোঁড়া অংশীদার। তাঁর মতে অ-ধনতান্ত্রিক পথ হচ্ছে এক ধরনের পুঁজিবাদ সৃষ্টি করার স্বাধীনতা। অবশ্য, তিনি বলেছেন যে, এই পুঁজিবাদ গড়ে উঠবে বুর্জোয়াদের একক একনায়কত্বে নয়, শ্রমিক ও বুর্জোয়াদের যৌথ একনায়কত্বে। তিনি বলেছেন: "ধনতন্ত্র গড়ে উঠলেই সমাজতন্ত্রমুখীনতা নষ্ট হয় না। দেখতে হবে, কোন রাষ্ট্রে তা হচ্ছে। যে রাষ্ট্রে বুর্জোয়ারা একচেটিয়া ক্ষমতাসীন এবং যে রাষ্ট্রে তাদের ক্ষমতা খণ্ডিত—এই দুই ধরনের রাষ্ট্রে পুঁজিবাদ অবশ্যই দুটি স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।"

আমরা জানি যে, পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামই হচ্ছে অ-ধনতান্ত্রিক পথের প্রধান মর্মবস্তু। অর্থাৎ, অ-ধনতান্ত্রিক পথ পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ। অবশ্য, অ-ধনতান্ত্রিক পথ চূড়ান্তভাবে পুঁজিবাদবিরোধী পথ হলেও এই পথ এক আঘাতেই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে না; এই পথের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে ক্রমশ দমন, নিয়ন্ত্রণ ও শেষে অবলুপ্ত করা হয়। সুতরাং, অ-ধনতান্ত্রিক পথেও পুঁজিবাদের বিকাশ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এর ফলে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের জায়গায় এ একচেটিয়া ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে।

শ্রীদাশগুপ্ত লেনিনের নতুন অর্থনৈতিক নীতি (NEP) সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বেও অ-একচেটিয়া পুঁজি রাশিয়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীদাশগুপ্তের এই ব্যাখ্যা কি সঠিক?

আসলে নতুন অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে লেনিন দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্তভাবে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি যে পুঁজিবাদের বিকাশকে উৎসাহিত করেছিলেন তা অ-একচেটিয়া পুঁজিবাদ নয়; তা হচ্ছে কৃষক ধনতন্ত্রের বিকাশ, ছোট ছোট পণ্য উৎপাদনের বিকাশ। কৃষককে তার উৎপন্ন ফসলের একাংশ বাজারে বিক্রী করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। লেনিন এই নীতিকে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কৃষককে অর্থনৈতিক সুবিধাদানের নীতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যাই হোক, পুঁজিবাদের এই বিকাশ ঘটেছিল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে, যার অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধ্বংস করা। সংক্ষেপে, এ হচ্ছে পুঁজিবাদের

বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর এক দীর্ঘ সংগ্রাম। সুতরাং, লেনিনের নতুন অর্থনৈতিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদের ভিত্তিকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করা। এই নীতি পুঁজিবাদকে দৃঢ় ও সংহত করার নীতি নয়; এই নীতি পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার নীতি।

অ-ধনতান্ত্রিক পথের মাধ্যমে পুঁজির যে বিকাশ ঘটবে তা অ-একচেটিয়া পুঁজিবাদ নয়, তা হচ্ছে কৃষক ধনতন্ত্রের বিকাশ, অর্থাৎ ছোট ছোট পণ্য উৎপাদনের বিকাশ যা গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা ঘটবে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের চৌহদ্দীর মধ্যে। কারণ, শ্রমিক ও বুর্জোয়াশ্রেণীর যৌথ একনায়কত্বে এটা ঘটলে এর বিকাশ ব্যাহত হবে এবং অ-একচেটিয়া ও একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশের গতি রোধ করা যাবে না। সুতরাং, অ-পুঁজিবাদী পথ হচ্ছে অ-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশের স্বাধীনতা—এই বক্তব্য লেনিনবাদী নীতি থেকে এক মারাত্মক বিচ্যুতি।

শ্রীদাশগুপ্ত, নরহরিবাবুর বক্তব্যের বিরুদ্ধে আরো অনেক বক্তব্য হাজির করেছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের কথা বলেছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিগুলোকে প্রতিটি দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে হবে, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের অর্থ তার মূল সূত্র বা নীতিগুলোর সংশোধন নয়। শ্রীদাশগুপ্ত, আসলে, সৃজনশীল প্রয়োগের নামে এই সব মূল সূত্র বা নীতিগুলোর সংশোধনই দাবী করেছেন।

—সত্য রায়

বিয়োগপঞ্জী

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

হিরণ কুমার সান্যাল

বিজন ভট্টাচার্য

MULYAYAN
Vol. XIII. No. 3

Regd. No.—WB/SC-16
R. N. 13785/65

টনিক খেকে ঘাই-ডুপ—
লক্ষ লক্ষ গৃহের আমরা পারিবারিক বন্ধু

ফাইজার ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্—লক্ষ লক্ষ
দেশবাসীকে খুশিয়ে চলেছে উৎকৃষ্ট ওষুধ

'পড়লে ঠেকায় আসল বন্ধু চেনা যায়'—যে কোন প্রবাদ অনুযায়ী আমাদের ঘাড়াই ক'রে নিতে পারেন। শুধু তাকেই ভাগ্যবানদের কাছে নয়, এদেশের লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের কাছে ছোটবড় সকলেরই আমরা পারিবারিক বন্ধু। বুড়ো ঠাকুরদার জন্যে যেমন আই-ডুপ, তেমনি বাড়ন্ত শিশুর জন্যে টনিক—আমরা মজুত রাখি। তাছাড়াও আমরা তৈরি করি বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ওষুধপত্র—সকলের সাধ্যে কুলোয় এমন দামে।

এ কাজে আমরা হাত দিই সেই ১৯৩৬ সালে।
আদর্শবান কর্মীবৃন্দ বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ আর ভেষজতত্ত্ব বিদের সাধারণ মানুষকে ওষুধ যোগানোর বতে গড়ে তুলেছিলেন ফাইজার ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড।
ওষুধের গবেষণা, উন্নয়ন আর নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো—এই ছিল তাঁদের ব্রত।

ফাইজার ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড.
কলিকাতা ১৬

ফাইজার ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড আপনাদের সেবায়